ইউনিয়ন থিয়েটার' প্রভৃতির নাম করা প্রয়োজন। 'ট্রেড ইউনিয়ন থিয়েটার' সম্প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে; লেনিনগ্রাডে এই থিয়েটারের প্রকাণ্ড একটি গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। এখানে শোলোখবের 'সয়েল আপ্‌টার্ণড' বইখানির অভিনয় আধুনিক নাট্যকলার একটি নূতন যুগ প্রবর্ত্তন করে। এখানে সেকস্‌পিয়ারের বিয়োগান্ত নাটক-গুলির অভিনয় হয়, অবশ্য এজন্য উক্ত নাটকগুলির যথারীতি অনুবাদ করা হয়।

ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জন্যও থিয়েটার আছে। থিয়েটার যে কেবলমাত্র প্রাপ্ত বয়স্ক লোকের জন্য নয়, ছেলেমেয়েদেরও থিয়েটারের প্রয়োজন আছে একথা রুশ থিয়েটারের দিকে না চাহিলে বোঝা যায় না। তথায় ছেলেমেয়েদের আত্ম বিকাশের জন্য অনেক ব্যবস্থাই করা হইয়াছে, তাহার মধ্যে এই থিয়েটার একটি। এরকম থিয়েটারের দুইটি ভাগ আছে; একটিতে ছয় সাত বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ছেলেমেয়েরা যাইতে পারে, অপরটি আর একটু বেশি বয়সের ছেলেমেয়ের জন্য। প্রথমটিতে পুতুলের সাহায্যে অভিনয় দেখান হয়, দ্বিতীয়টিতে মেয়েপুরুষ অভিনয় করে। রাশিয়ান এই জাতীয় থিয়েটার বহু আছে। ছোটদের থিয়েটারে এমন সমস্ত নাটকের অভিনয় দেখান হয় যাহাতে আনন্দের সঙ্গে তাহারা খানিকটা শিক্ষা লাভ করে। তাহা ছাড়া অল্প বয়স হইতে ছেলেমেয়েদের ভাল জিনিষ দেখার অভ্যাসও বেশ হইতে থাকে।

লেনিনগ্রাডের সামরিক থিয়েটারগুলিও উল্লেখযোগ্য। 'থিয়েটার অফ্‌ রেড্‌ আরমি' এবং 'থিয়েটার অফ্‌ রেড্‌ ন্যাভি' নাট্যকলাকে অনেক দিক দিয়া সমৃদ্ধশালী করিয়াছে। আর একটি বিখ্যাত থিয়েটার হইতেছে 'এথনোগ্রাফিক থিয়েটার'। এখানে দেশের বিভিন্ন স্থান হইতে অভিনেতা অভিনেত্রী সংগ্রহ করিয়া অভিনয় দেখান হয়। নাটকের ভিতর দিয়া দেশের অন্তরের কথাটিকে প্রকাশ করিতে হইলে এইরূপ থিয়েটারেরই প্রয়োজন। এখানে বেশ একটি স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করা যায়। সাধারণত থিয়েটারে যে-প্রাদেশিকতা দেখা যায় এখানকার নাটক উহা হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত। অনেক বিদেশীই 'এথ্‌নোগ্রাফিক থিয়েটারের' উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন।

'মিউজিকহল'-এর নাম না করিলে আমাদের আলোচনা অসম্পূর্ণ রহিবে। এখানকার প্রযোজক বিশ্ববিখ্যাত, ইঁহারই প্রযোজনায় কয়েক বৎসর আগে 'হ্যামলেট' অভিনীত হইয়াছিল। 'মিউজিক হল' রাশিয়ার নাট্য জগতে পথ প্রদর্শকের কাজ করিতেছে।

লেনিনগ্রাডে এতগুলি থিয়েটার খুব ভাল ভাবেই চলিতেছে। কিন্তু তাই বলিয়া তথায় সিনেমাগুলি যে ম্লান হইয়া আসিয়াছে তাহা নহে; রাশিয়ায় সিনেমাও যথেষ্ট উন্নতিলাভ করিতেছে। এখানে আমাদের একটী শিখিবার বিষয় আছে। আমাদের দেশে

অধুনা থিয়েটার তাহার পূর্ব্বতন গৌরব হারাইয়া ফেলিয়াছে। ইহার কতকগুলি কারণ আছে, তাহার মধ্যে একটি, সিনেমার প্রসার। এই তো সামান্য কিছুদিন আগেকার কথা, কলিকাতায় একই সঙ্গে কতকগুলি রঙ্গমঞ্চ শত শত দর্শকের মনোরঞ্জন করিয়াছে। আজ তাহাদের কোনটির অস্তিত্ব নাই, কোনটি বা অতিকষ্টে আপনার প্রাণের শিখাটি জ্বালাইয়া রাখিয়াছে, একটি দমকা বাতাসেই নিভিয়া যাইবে। আজ মহানগরীর বিজ্ঞাপন-সংক্ষুব্ধ দেওয়ালে থিয়েটারের বিজ্ঞাপন খুঁজিয়া বাহির করিতে হয়।

আমাদের দেশে থিয়েটারের একটি বড় ট্র্যাডিশন আছে, তাহা ছাড়া থিয়েটারের প্রতি বাঙ্গালীর অন্তরের টানও আছে। থিয়েটারের ভিতর দিয়া আমাদের জাতীয় জীবনের অনেক উন্নতি করা যায়, একথা মনে রাখা দরকার। এদেশে সিনেমার যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে, সিনেমার এই উন্নতি থিয়েটারের উন্নতির অন্তরায় নয়। লেনিনগ্রাডের থিয়েটারের আলোচনার ইহাই উদ্দেশ্য।
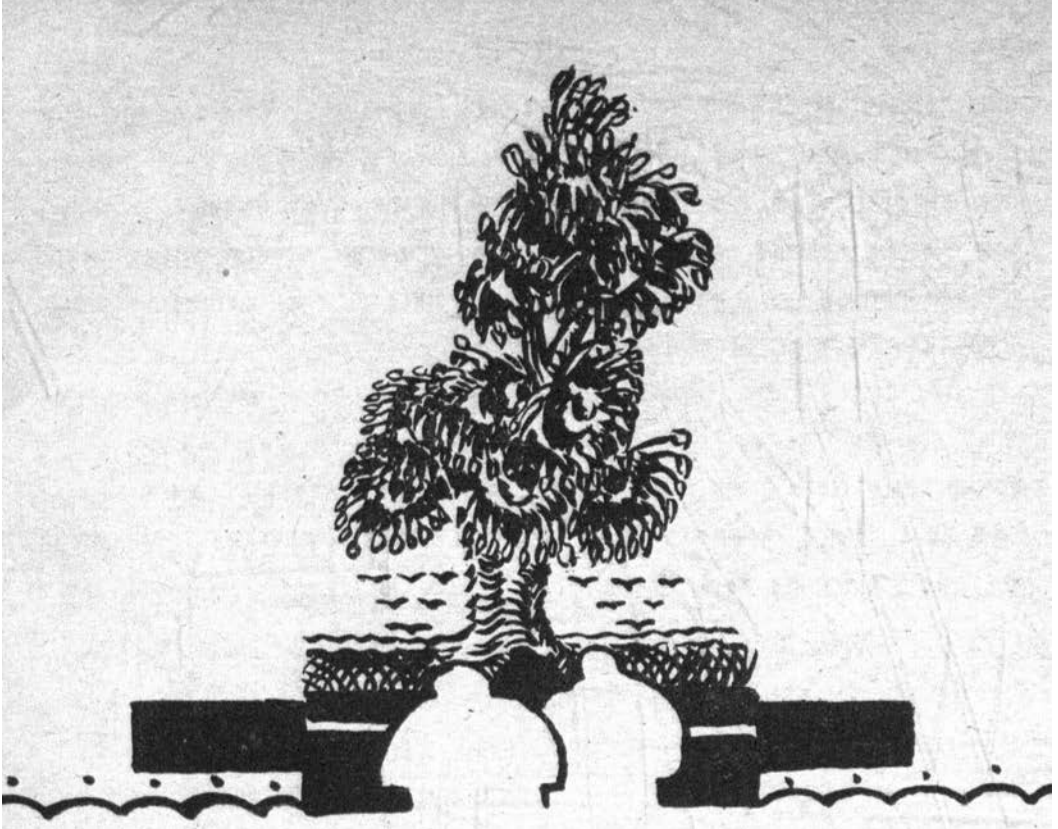
কলা-ভবন

চিত্রকলার সহিত জীবনের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ। এই সম্বন্ধ যেখানে উপেক্ষিত হইয়াছে সেইখানেই চিত্রকলা অস্বাভাবিক ও অপ্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে। তাই কোন চিত্রকলার আলোচনা করিতে হইলে প্রথমেই দেখিতে হইবে জীবনের সহিত ইহার প্রকৃত যোগ আছে কিনা; তবেই আমরা বুঝিতে পারিব রসানুভূতির দিকে ইহা আমাদিগকে কতটা লইয়া গেল। অবশ্য এ বিচারের কোন মাপকাঠি নাই, শেষ পর্যান্ত নির্ভর করিতে হয় ব্যক্তিগত ভাল লাগা না লাগার উপর। সাহিত্য-বিচারে যেমন চিত্রকলা বিচারেও তেমনি ব্যক্তিগত রুচি একেবারে অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু তাই বলিয়া ইহাতে হতাশ হইবার কিছু নাই। আমরা জানি, মন যত বেশি সংস্কৃত হইবে অনুভূতি যত বেশি সুক্ষ্ম হইবে ব্যক্তিগত রুচি ততই সার্ব্বজনীনতায় পরিণতি লাভ করিবে। ইহা না হইলে কি কবিতা কি গান কি ছবি কিছুই দেশকালের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া সকল দেশের সকল মানুষের আদরের বিষয় হইত না।

এখন প্রশ্ন এই—কি করিয়া আমাদের মন সংস্কৃত ও অনুভূতি সূক্ষ্ম করা যাইতে পারে, যাহার ফলে আমাদের রসোপলব্ধির ভিতরে ব্যক্তিগত রুচি ক্রমশ কমিয়া আসিবে? প্রশ্নটির উত্তরের উপর আমাদের ছবি দেখার সার্থকতা নির্ভর করিবে, নতুবা এদিকে সকল প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হইবে। ছবি আঁকা সহজ নয়, ছবি বুঝাও বিশেষ সহজ ব্যাপার নয়। ভাল শিল্পী হইতে হইলে সাধনার প্রয়োজন, ভাল ছবির রসোপলব্ধি করিতে হইলেও সাধনার প্রয়োজন। এই কথাটাই আমরা ভুলিয়া যাই। তাই দেখা যায়, যে-ছবি আদৌ ছবির পর্য্যায়ে পড়ে না তাহা দেখিয়া দর্শক প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছেন, অথচ যে-ছবি সত্যই চিত্তাকর্ষক তাহার দিকে কেহ ফিরিয়া তাকাইতেছেন না। আমাদের এই ভুল সংশোধনের সময় আসিয়াছে।
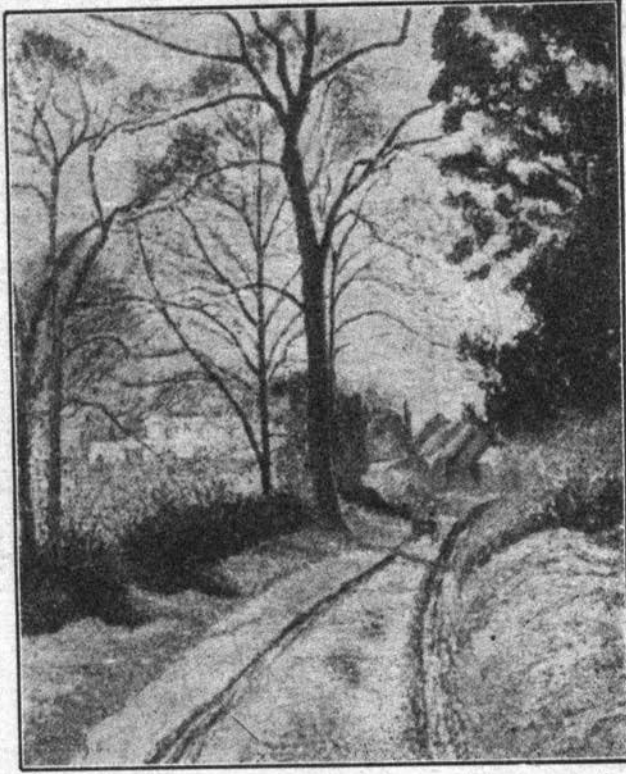
CROCCFORD LANE by LUCIEN PISSARRO

লুসিয়েন্ পিসারো :—১৮৬৩ সনে পিসারোর জন্ম হয়, ইঁহার পিতার নাম ক্যামিল পিসারো। ইঁহার উপর ইমপ্রেশনিস্ট ও নিউ ইমপ্রেশনিস্টদের প্রভাব যথেষ্ট ছিল। ইনি ইংলণ্ডে আসিয়া বাস করিতে থাকেন, ইংলণ্ডে যে কয়জনের সহিত পিসারোর পরিচয় ঘটে তাঁহাদের মধ্যে উইলাম মরিসের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। ইংলণ্ডে ইম্‌প্রেশনিজমের প্রবর্ত্তনের মূলে পিসারোর প্রচেষ্টা যথেষ্ট পরিমাণে ছিল।

SEATED WOMAN　　by PABLO PICASSO

পাবলো পিকাসো :—১৮৮১ সনে পিকাসোর জন্ম হয়। পিকাসো জাতিতে স্পেনীয়। প্যারিতে আসিয়া ইনি চিত্রকলার অনুশীলনে আত্মনিয়োগ করেন। ইঁহার উপর সেজান এবং এল্‌গ্রেকোর প্রভাব নজরে পড়ে। পিকাসো চিত্রকলায় কিউবিজ্‌ম পদ্ধতির প্রবর্ত্তন করেন। ১৯৩১ সনে লণ্ডনে পিকাসোর একটী চিত্র-প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান করা হইয়াছিল। পিকাসোর অসামান্য প্রতিভা আজ সকলকেই মুগ্ধ করিয়াছে।

শিল্পে শিল্পীর ব্যক্তিত্ব

শুভেন্দু ঘোষ

শিল্প ব্যক্তির রচনা, সন্দেহ নাই; তবু তা ব্যক্তির রচনা নয়। এই স্বতঃ বিরোধের অর্থ হচ্ছে, ব্যক্তিত্ব হচ্ছে সামাজিক ব্যাপার। সামাজিক পরিবেশের মধ্যেই ব্যক্তিত্ব জন্ম নেয়, বিকাশ পায়, তার গুণ পরিস্ফুট হয়। ব্যক্তিত্বের ধারণা, ব্যক্তিত্বের উপলব্ধি, ব্যক্তিত্বের গুণ—সবই সমাজ সাপেক্ষ। সোজা ভাষায়, ব্যক্তি শুধু ব্যক্তি নয়- সে সামাজিক জীব, প্রাকৃতিক জীব।

শিল্পের ভিতর দিয়ে মানুষ মানুষকে নিবিড়ভাবে স্পর্শ করতে পারে, কারণ শিল্পী তখন ব্যক্তি মাত্র নয়, সে মানুষ। শিল্প মানুষের একান্ত ব্যক্তিসত্তার তোয়াক্কা রাখে না—বহন করে তার সামাজিক ও প্রাকৃতিক সত্তার পরিচয়। শিল্পের যা প্রাণবস্তু, সেটা মানুষের সামাজিক উপলব্ধি থেকে উদ্ভূত, তার প্রাকৃতিক উপলব্ধি হতে উদ্ভূত। এ উপলব্ধি সম্বন্ধে আমরা সাধারণতঃ সচেতন নই, কারণ এ উপলব্ধি অবচেতন চিত্তের। অথচ সর্ব চিন্তা ও ভাবের, সকল কর্ম প্রেরণার মূলে এই উপলব্ধি। সর্ব প্রেরণার মূলগত এই উপলব্ধি সম্বন্ধে সচেতন নই বলেই আমরা ব্যক্তিগত জীবনকে এতো প্রাধান্য দিই—অথচ এই গুহ্যাতীত উপলব্ধিই মানুষের সাড়ে পনের আনা, ব্যক্তিগত জীবনের উপলব্ধি তো এর কাছে অতি সামান্য।

য়ুঙ্গ ঠিকই বলেছেন—"বুদ্ধিজাত ধ্যান ধারণা আমাদের কর্মধারাকে সবচেয়ে কম প্রভাবিত করে। আমাদের গোপন মনের অভিজ্ঞতা যখন ধ্যান ধারণারূপে মূর্ত্ত হয়ে ওঠে, তখনই তা প্রাবল্য পায়, যুক্তিতর্কের বাঁধন মানে না, নীতির প্রশ্নকে উপেক্ষা করে চলে: মানুষ বা তার মস্তিষ্ক তখন তার সঙ্গে পেরে ওঠে না। মানুষ ভাবে, সে-ই বুঝি এই সব ধ্যান ধারণার জন্মদাতা; আসলে কিন্তু ঐ গুলোই তাকে ছাঁচে ফেলে, মানুষকে তাদের অনিচ্ছুক মুখপাত্র করে তোলে।"

মার্ক্স এঙ্গেলস্ পত্রাবলীতেও মতবাদের উৎপত্তিরও মোটামুটি এই রকমের একটা ইঙ্গিত রয়েছে। "যে প্রেরণার বশে দার্শনিকের দর্শনধারা গড়ে ওঠে, সেটা তার অজ্ঞাত থেকে যায়। দার্শনিক সজাগ ভাবেই কাজ করেন বটে, কিন্তু সেটা সত্যিকার সজাগতা নয়।"

সামাজিক ও প্রাকৃত সত্তার উপলব্ধি মানুষের মৌখিক উপলব্ধি। প্রাণশক্তি হতে উদ্ভূত বলে প্রাণশক্তিকে স্পর্শ করতে পারে এই উপলব্ধি। শিল্পী এই উপলব্ধিকে রূপায়িত করেন—অবচেতনকে চেতনার স্তরে আনেন। এই জন্যই শিল্প ও শিল্পী হচ্ছে, স্টালিনের ভাষায়, 'আত্মার কারিগর'।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা পাচ্ছি, "যে শিল্প যত নৈর্ব্যক্তিক, তা তত প্রাণবান্।" কথাটা ভুল বোঝা সহজ, কারণ ঐ-কথায় এরকম ভাবেও বলা চলে, "যে শিল্প যত ব্যক্তিত্বময়, সেটা তত প্রাণবান্!" ব্যক্তিত্বের সমস্তটাই প্রায় সামাজিক ও প্রাকৃতিক। অস্কার ওয়াইল্ড তাঁর 'ডি প্রোফাণ্ডিসে' যখন বলেছেন, "অধিকাংশ মানুষই যেন অন্য মানুষ, তাদের ভাব চিন্তা সবই অন্যের।" তখন তিনি স্বভাবসুলভ বাক্‌চাতুরী করেন নি। অধিকাংশ মানুষই এখনও ব্যক্তিত্বে পঙ্গু, গণ্ডীবদ্ধ; অধিকাংশ মানুষেরই সত্তা বর্ত্তমান সমাজব্যবস্থার রূঢ়তায় আত্মরত। সামাজিক ও প্রাকৃতিক সত্তার উপলব্ধি যতো গভীর যতো বেশী, সমগ্র মানুষের পরিচয় তত সুস্পষ্ট। ব্যক্তির প্রখর উপলব্ধি এই জন্যই নৈর্ব্যক্তিক,—সামাজিক, প্রাকৃতিক। সমাজ ব্যবস্থায় জড়তা থাক্‌তে পারে, সমাজ দেহে জড়তা থাক্‌তে পারে, কিন্তু সমাজ প্রাণের—প্রাকৃতিক ও সামাজিক প্রাণশক্তির জড়তা নাই, তা সর্বদা প্রবহমান। সামাজিক উপলব্ধি রূপায়িত হলে এই প্রাণশক্তি অভিব্যক্ত হয়। শিল্পে মানুষ নিজেকে চেনে, মানুষ সত্তায় প্রতিষ্ঠিত হয়। এলিস্ তাঁর 'জীবন নৃত্য' গ্রন্থে যেখানে বলেছেন: "মানুষ যখন তার স্বসত্তার চরমে পৌঁছায়, তখন সে সমূহের নমুনা হয়ে ওঠে।" মানুষের গভীরতম উপলব্ধি যে সামূহিক উপলব্ধি, এ কথার ইঙ্গিত যুগে যুগে মনীষীরা দিয়ে এসেছেন। যুগে যুগে এই শিল্প সত্যেরই সাক্ষী হয়ে এসেছে।

এখানে প্রশ্ন হতে পারে, শিল্পে ব্যক্তিত্বের ছাপ পড়লে শিল্প কি পঙ্গু হয়? স্ট্রিণ্ডবের্গ, ডস্টয় এফ্‌স্কি প্রভৃতির সাহিত্যে তাঁদের ব্যক্তি-জীবনের ছায়া অতি সুস্পষ্ট! তাঁদের শিল্প কি পঙ্গু? এর উত্তর: শিল্পের যে ব্যক্তির ছায়া বলে ধরা পড়ে, সেটা পঙ্গুতাই। ব্যক্তিগত জীবনের গভীর বেদনা যখন গুহাহিত মনের রস জারিত হয়ে বেরোয় তখন তা আর বৈ্যক্তিক থাকে না—সামূহিক হয়ে ওঠেই। যা ছায়াপাত করে তা ব্যক্তিত্ব নয়, ব্যক্তিত্বের ব্যাহতি—frustration, চিত্তরসের জ্যোতিম্লান তার হয় নি। পূর্বের একটা উপমা ব্যবহার করে সেইজন্যে বলতে হয়, "মন রূপ পেঁয়াজের ওপরকার খোসার যতই রঙ ধরুক, তার প্রকাশে শিল্প হয় না। প্রাণের বীজের তেজে তাতে যে রঙ্ ধরে, তার রূপে গড়ে ওঠে শিল্প।"

আমার জীবন

(শেখভ্)

গোপাল ভৌমিক

(৩)

আমাদের জেলায় একটি রেলওয়ে তৈরী হ'চ্ছিল। ছুটির দিন ময়লা ছেঁড়া ন্যাকড়া-পরা রেলের কুলিরা এসে সহরে ভীড় করত। সহরের লোকেরা এদের ভয় করত। আমি মাঝে মাঝে দেখ্‌তাম এই সব হতভাগাদের কাউকে পুলিশে ধ'রে টান্‌তে টান্‌তে নিয়ে যাচ্ছে—তার মুখ লাল, মাথায় টুপি নেই—আর পিছনে তার অপরাধের চিহ্ন—একটা স্যামোভার্ কিংবা একখানা ভিজে সদ্যধৌত কাপড়। রেলের কুলিরা এসে বেশ্যাপল্লীতে কিংবা স্কোয়ারে ভিড় জমাত; তারা মদ এবং খাবার খেত—শপথ করত আর সহরের বেশ্যাদের শিষ দিয়ে ডাকত। এদের আনন্দ দেওয়ার জন্য দোকানীরা বিড়াল এবং কুকুরকে মদ খাওয়াত কিংবা কুকুরের লেজে কেরোসিনের টিন বেঁধে তার পিছনে শিষ দিত—ফলে কুকুরটা রাস্তা দিয়ে ছুটতে থাক্‌ত—ওর পিছনের টিনটায় শব্দ হ'ত আর ও মনে করত যে পিছনে বোধ হয় কোন ভীষণ দৈত্য আস্‌ছে—কুকুরটা দৌড়াতে দৌড়াতে সহর ছেড়ে মাঠের দিকে চ'লে যেত। সহরে এমন কয়েকটি কুকুর ছিল যারা এই সব অত্যাচারে চিরকালের জন্য ভয় পেয়ে গেছিল—এই কুকুরগুলি দুই পায়ের মধ্যে লেজ গুটিয়ে ভয়ে ভয়ে ঘুরে' বেড়াত—লোকে বল্‌ত যে সে কুকুরগুলি পাগল হ'য়ে গেছে।

সহর থেকে পাঁচ মাইল দূরে ষ্টেশন তৈরী হ'চ্ছিল। লোকে বল্‌ত যে ষ্টেশন আরও নিকটে আনার জন্য এঞ্জিনিয়ার্ পঞ্চাশ হাজার রুবল ঘুষ চেয়েছিলেন কিন্তু মিউনিসিপ্যালিটি চল্লিশ হাজারের বেশী দিতে রাজী নয়; সেই বাকী দশ হাজার রুবল্ না দিতে চাওয়ার জন্য আজ সহরের সবাই দুঃখিত 'কারণ দশ হাজারের অনেক বেশী খরচ ক'রে এখন ষ্টেশন পর্য্যন্ত একটি রাস্তা তৈরী কর্‌তে হচ্ছে। তক্তা ফেলে তার উপর রেল্‌লাইন তৈরী শেষ হ'য়েছিল; কুলী এবং মাল মশলা নিয়ে ট্রেণও যাতায়াত করছিল; ডল্‌ঝিকভ্ একটা সেতু নির্ম্মাণ করছিলেন—সেইটা এবং এখানে ওখানে দুই চারিটি ষ্টেশন তৈরী শেষ হ'লেই কাজ শেষ হয়।

আমাদের প্রথম ষ্টেশন ডুবেক্নিয়া সহর থেকে সতের ভার্ষ্ট (এক ভার্ষ্ট প্রায় ⅔ মাইলের সমান) দূরে। আমি হেঁটেই চল্‌লাম। শীতকাল এবং বসন্ত কালের উজ্জ্বল সবুজ শস্য সূর্যালোকে জ্বল্‌ছিল। সমান উজ্জ্বল রাস্তা—দূরে দেখ্‌তে পেলাম ষ্টেশন, পাহাড় আর গোলাবাড়ী···উন্মুক্ত পৃথিবী কি সুন্দর দেখ্‌তে। আমার মনে স্বাধীনতার আস্বাদের জন্য কি ব্যাকুল প্রার্থনা—শুধু যদি সেই সকাল বেলার জন্য সহরের কথা ভুল্‌তে পার্‌তাম—ভুল্‌তে পার্‌তাম আমার প্রয়োজন আর ক্ষুধার কথা! ক্ষুধার চিন্তাই আমার জীবনের সব চেয়ে বড় চিন্তা। ক্ষুধার তীব্রতায় আমার সুন্দর ভাবগুলি পরিজ্, কাট্‌লেট্ আর ভাজা মাছের চিন্তার সংগে মিশে' যায়। যখন মাঠে একা দাঁড়িয়ে শূন্যে ভাসমান চাতক পাখীর মধুর গান শুনি, তখন ভাবি: "কিছু রুটি আর মাখন পেলে খুবই ভাল হ'ত।" অথবা যখন রাস্তার ব'সে চোখ বুজে বসন্ত প্রকৃতির অপূর্ব্ব শব্দ-সমারোহ উপভোগ করি তখন আমার মনে প'ড়ে যায় গরম আলুর গন্ধ কি মিষ্টি! স্বাস্থ্যবান্ এবং হৃষ্টপুষ্ট হওয়ায় আমার কখনও পর্যাপ্ত ভোজন হয় না; কাজেই দিনের বেলায় আমার সব চেয়ে বড় চিন্তা হ'ল ক্ষুধা; এই জন্যই আমি বুঝ্‌তে পারি কেন এত লোক কেবল বেঁচে থাকার জন্য কাজ করে আর ক্ষুধার কথা ছাড়া কিছু বল্‌তে জানে না।

ডুবেক্নিয়ার ষ্টেশনের ভিতরে চূণকাম করা হ'চ্ছিল এবং জলের ট্যাংকের উপরে তালা তৈরী হ'চ্ছিল। সর্বত্র একটা গুমোট্ ভাব আর চূণের গন্ধ ভর্তি; কুলীরা স্তূপীকৃত ইঁট কাঠের উপর দিয়ে অলসভাবে হেঁটে বেড়াচ্ছিল; তার বাক্সের কাছে সিগ্‌ন্যাল্‌ম্যান্ ঘুমিয়েছিল—সূর্যের আলো সোজা তার মুখে এসে পড়্‌ছিল। আশে পাশে একটাও গাছ ছিল না; টেলিগ্রাফের তারের ভিতরে একটা অস্পষ্ট শব্দ—এখানে ওখানে অনেক পাখীও তারের উপর ব'সে ছিল। কি করতে হ'বে না জানা থাকায় আমি স্তূপের উপর দিয়ে হেঁটে বেড়াতে লাগ্‌লাম; আমার মনে পড়্‌ল আমি যখন এঞ্জিনিয়ারকে আমার কর্তব্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা ক'রেছিলাম, তিনি তখন ব'লেছিলেন: "সে সেইখানেই দেখা যাবে।" কিন্তু এই নির্জন জায়গায় দেখ্‌বার কি আছে? চূণকামের মিস্ত্রীরা ফোরম্যান্ এবং কোন্ এক ফিয়োডোর ভ্যাসিলিভিচ্ সম্বন্ধে আলাপ করছিল। আমি না বুঝ্‌তে পেরে অস্বস্তি অনুভব কর্‌লাম—কেমন একটা শারীরিক অস্বস্তি। আমি আমার বাহু পা এবং সমস্ত বৃহৎ দেহটা সম্বন্ধে সচেতন হ'য়ে উঠ্‌লাম কিন্তু বুঝ্‌তে পার্‌লাম না এদের দিয়ে কি করি বা কোথায় যাই।

অন্তত দুঘণ্টা হেঁটে বেড়াবার পর আমি লক্ষ্য কর্‌লাম যে ষ্টেশন থেকে লাইনের দক্ষিণ দিকে প্রায় দেড় মাইল দু' মাইল পর্য্যন্ত টেলিগ্রাফের খুঁটি দেখা যায়—তারপর দেখা

যায় একটা শাদা পাথরের দেয়াল। কুলীরা বল্‌ল যে ওটা অফিস্—অবশেষে আমি স্থির কর্‌লাম যে ওইখানেই আমাকে যেতে হ'বে।

ওটা একটা বহুদিনের অব্যবহৃত গোলাবাড়ী। কঠিন শাদা পাথরের দেয়াল ক্ষ'য়ে গেছিল—স্থানে স্থানে ধ্ব'সেও পড়্‌ছিল—পার্শ্বস্থ গৃহের ছাদ—যার ছিদ্রহীন দেয়াল রেললাইনের দিকে—ফুটো হ'য়ে গেছিল, ফলে এখানে ওখানে টিন্ দিয়ে জোড়াতালি দিতে হ'য়েছিল। সদর দরজার মধ্য দিয়ে দেখা যায় ভিতরে বড় বড় ঘাসে-ঢাকা মস্ত বড় উঠান—তারপরে দেখা যায় পুরানো একটা ঘর—ঘরটার জানালায় ভেনিসীয় ধরণের খড়্‌খড়ি আর ছাদটা ময়লা-ধরা ধূসর। বাড়ীটার ডাইনে বাঁয়ে দুদিকেই দুটো পার্শ্ব-গৃহ; একটা পার্শ্বগৃহের জানালাগুলো বন্ধ—অপরটার খোলা জানালার পাশে কয়েকটি বাছুর চ'রে বেড়াচ্ছিল। শেষ টেলিগ্রাফের খুঁটিটা উঠানের মধ্যে দাঁড়িয়েছিল—ছিদ্রহীন দেয়ালওয়ালা পার্শ্বগৃহটির মধ্যে টেলিগ্রাফের তার চ'লে গেছে দেখ্‌লাম। দরজাটা খোলা ছিল—আমি ভিতরে গেলাম। টেবিলে টেলিগ্রাফ যন্ত্রের সাম্‌নে যে লোকটি ব'সেছিল তার মাথায় কালো কোঁক্‌ড়ানো চুল। সে আমার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে কঠিন ভাবে তাকালো কিন্তু পর মুহূর্তেই মৃদু হেসে বল্‌ল: "কিহে 'কম-লাভ', কেমন আছ?"

লোকটি আমার ছোটবেলার স্কুলের বন্ধু আইভ্যান্ শেপ্রাকভ্—নবম শ্রেণীতে পড়ার সময় ধূমপানের অপরাধে ও স্কুল থেকে বিতাড়িত হ'য়েছিল। একদিন হেমন্তকালে ভোরবেলা আমরা পাখী শিকারে বেরিয়েছিলাম উদ্দেশ্য ছিল বাপ মা ঘুম থেকে উঠ্‌বার আগেই আমরা সেগুলো বাজারে বিক্রয় করব। আমরা কয়েকটী পাখীকে গুলি মেরেছিলাম—তারপর আহত পাখীগুলিকে কুড়িয়ে এনেছিলাম। কয়েকটী পাখী কি অসীম যন্ত্রণা পেয়েই না ম'রেছিল—এখনও আমার মনে আছে রাত্রিবেলা খাঁচার মধ্যে পাখীগুলির কাতর আর্তনাদ—কয়েকটা পাখী অবশ্য বেঁচেছিল। আমরা সেগুলোকে বিক্রী ক'রেছিলাম—ওগুলো যে পুরুষপাখী সে বিষয় নিয়ে আমরা শপথ করতেও কসুর করিনি। একবার বাজারে আমার কাছে মাত্র একটি পাখী ছিল—আমি সেটাকে ফেরি ক'রে এক কোপেক্ দামে বেচেছিলাম। আমি নিজেকে সান্ত্বনা দেওয়ার উদ্দেশ্যে ব'লেছিলাম: "খুব কম লাভ"! সেই সময় থেকে স্কুলে আমার নাম হ'ল "কম লাভ"। এখনও স্কুলের ছেলেরা এবং সহরের লোকেরা আমাকে ক্ষেপানোর উদ্দেশ্যে ওই নাম ব্যবহার করে কিন্তু আমি ছাড়া ও নামের জন্ম-রহস্য আর কারও মনে ছিল না।

শেপ্রাকভ্ কখনও বলিষ্ঠদেহ ছিল না। ওর বুক ছোট, ঘাড় গোল আর পা' লম্বা। ওর গলার টাই দড়ির মত মনে হ'ল—ওর পরণে ওয়েস্ট কোট্ ছিল না—আমার

বুটের চেয়েও ওর বুটের অবস্থা খারাপ—বুটের গোড়ালি ক্ষ'য়ে গেছিল। ওর চোখ মিট মিট্ কর্‌ছিল—ওর চোখে মুখে একটা উৎসুকভাব কি যেন একটা ধর্‌বার চেষ্টা—আর ছিল একটা অহেতুক চাঞ্চল্য।

"দাঁড়াও" ও কি যেন খুঁজ্‌তে খুঁজ্‌তে বল্‌ল। "দেখ···আমি এখনই কি বল্‌ছিলাম ?"

আমরা কথাবার্তা বলা সুরু কর্‌লাম। আমি জানতে পার্‌লাম যে এই সম্পত্তিটা সেদিনও শেপ্রাকভ্‌দের ছিল—মাত্র আগের হেমন্তে ডল্‌ঝিকভ্ কিনে নিয়েছেন। ডল্‌ঝিকভ্ শেয়ার্ কেনার চেয়ে জমি কেনাই বেশী লাভ জনক মনে কর্‌তেন এবং ইতিমধ্যে আমাদের জেলায় তিনটী বন্ধকী সম্পত্তি কিনে ফেলেছিলেন। যখন শেপ্রাক্‌ভের মা সম্পত্তিটা বিক্রী করেন তখন তিনি সর্ত ক'রে নিয়েছিলেন যে তাঁরা আরও দু'বছর এই পার্শ্ব গৃহটায় বাস করবেন এবং তাঁর ছেলেকে ডলঝিকভ্ একটা চাকরী দেবেন।

"তিনি কিন্‌বেন না কেন ?" শেপ্রাকভ্ এঞ্জিনিয়ারের সম্বন্ধে বল্‌ল। "উনি ঠিকাদারদের কাছ থেকে অনেক টাকা পান—নিজেও তাদের সবাইকে ঘুষ দেন কিনা !"

তারপর সে আমাকে খেতে নিয়ে গেল। সে তার স্বভাবসুলভ জোর প্রয়োগ ক'রে ব্যবস্থা কর্‌ল যে আমাকে তার সংগে থাক্‌তে হ'বে আর তাদের বাড়ীতে খেতে হ'বে।

সে বল্‌ল : "মা বড় কৃপণ কিন্তু তোমার কাছ থেকে বেশী কিছু আদায় করবে না।" যে ছোট ঘরগুলোয় তাঁর মা থাক্‌তেন সেখানে বড় বিশৃঙ্খলা ; এমন কি বড়ঘর এবং পথটাও আস্‌বাবে বোঝাই ; বাড়ী বিক্রয়ের পর আসবাব পত্র সরিয়ে এনে এখানে রাখা হ'য়েছে। আসবাবগুলো সব পুরানো এবং লাল কাঠের তৈরী। মিসেস্ শেপ্রাকভ্ মোটাসোটা বয়স্কা ভদ্রমহিলা—চীনাদের মত বাঁকা চোখ। তিনি জানালায় বড় একটা চেয়ারে ব'সে মোজা বুন্‌ছিলেন। আমাকে খুব সৌজন্যের সংগে অভ্যর্থনা জানালেন।

"মা, এ পলোজ্‌নিভ" শেপ্রাকভ্ আমার পরিচয় দিল। "ও এখানে কাজ করবে।" "তুমি ভদ্রঘরের ছেলে ত ?" তিনি অদ্ভুত অস্বস্তিকর গলায় প্রশ্ন কর্‌লেন যেন তাঁর গলায় ফুটন্ত চর্বি ভর্তি।

"আজ্ঞে হ্যাঁ" আমি উত্তর দিলাম।

"বস।"

খাবার বড় খারাপ—সামান্য মাত্র টক্ দই দেওয়া পাই আর দুধের একটা কি ঝোল। আমার অতিথি সেবিকা এলেনা নিকিফিরোভ্‌না অনবরত একচোখে বাঁকা দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিলেন। তিনি কথা বল্‌ছিলেন আর খাচ্ছিলেন কিন্তু তাঁর চেহারায় একটা মরার

মত ভাব ছিল—শবদেহের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছিল ব'ল্‌লেও অত্যুক্তি হয়না। তাঁর মধ্যে প্রাণ ছিলনা বললেই হয় তবু তাঁর গৃহকর্ত্রী ভাবটা অটুট ছিল। এককালে তাঁর অনেক চাকর ছিল—তাঁর স্বামী ছিলেন জেনারেল্—চাকররা তাঁকে "হুজুর" ব'লে ডাক্‌ত। যখন পুরানো দিনের এই লুপ্তশিখা মুহূর্তের জন্যও তাঁর মনে জেগে উঠ্‌ছিল, তখনই ছেলেকে সম্বোধন ক'রে বল্‌ছিলেন: "আইভ্যান্, ছুরিত অমন ক'রে ধরে না। জানো আমরা সবে এই সম্পত্তি বিক্রী ক'রেছি। অনুতাপের বিষয় অবশ্য এই এখানে বাস করা আমাদের অভ্যাস হয়ে গেছে—তবে ডল্‌ঝিকভ্ আইভ্যান্‌কে ডুবেক্‌নিয়ার স্টেশন মাস্টার ক'রে দেবেন ব'লেছেন—তাই আমাদের আর এস্থান ত্যাগ করে যেতে হ'বে না। আমরা এখানে স্টেশনে বাস করবো—তা' এই সম্পত্তিতে বাস করার মতই। এঞ্জিনিয়ার খুব চমৎকার লোক। তোমার কি তাঁকে খুব সুন্দর ব'লে মনে হয় না?"

এই সেদিনও শেপ্রাকভ্‌দের অবস্থা ভাল ছিল কিন্তু জেনারেলের মৃত্যুর সংগে সংগে সব বদ্‌লে গেছে। এলেনা নিকিফিরোভ্‌না প্রতিবেশীদের সংগে ঝগড়া ক'রে মামলা করা সুরু করলেন; তিনি সরকার এবং কুলিদের মাইনে দিতেন না; তাঁর মনে সব সময়ই এই ভয় যে তাঁকে বুঝি সবাই ঠকাচ্ছে-কাজেই দশ বৎসরের মধ্যেই ডুবেক্‌নিয়া সম্পূর্ণ বদলে গেল।

বাড়ীটার পিছনে একটা বাগান ছিল বড় বড় ঘাস আর ঝোপ ঝাড়ে বাগানটা ভর্তি। বাড়ীর সমতল ছাদটা এখনও সুন্দর সযত্নরক্ষিত ছিল আমি সেই ছাদে ঘুরে' বেড়ালাম; কাচের জানালার মধ্যে একটা সুন্দর ঘর দেখ্‌তে পেলাম সেটা নিশ্চয়ই বৈঠকখানা ছিল। ঘরটার মধ্যে একটা পুরানো পিয়ানো আর দেয়ালে মেহগিনি ফ্রেমের কয়েকটি চিত্র ছিল-আর কিছু ছিলনা। ফুলের বাগানের আর কিছু ছিলনা—কয়েকটি পিয়নি এবং পপির গাছ সাদা আর লাল মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়েছিল; পথের উপরে এল্‌ম আর মেপ্‌ল্ গাছের জটলা—প্রায় সব গাছের আগাই গরুতে খেয়ে ফেলেছে। জংগল এত ঘন যে ভিতরে যাওয়া অসম্ভব; কেবল মাত্র বাড়ীর সাম্‌নেটায় কয়েকটা পপ্‌লার, ফার্ এবং পুরানো লেবুর গাছের মধ্য দিয়ে এখনও দু'একটি পথের সন্ধান মেলে। দূরে মাঠ তৈরীর উদ্দেশ্যে বাগানটা পরিষ্কার করা হ'চ্ছিল। সেখানে জংগল বাড়্‌তে দেওয়া হ'তনা—মাকড়সার জালে মানুষের মুখ চোখও ভ'রে যেত না—ওখানকার বাতাসটাও বেশ মধুর। আরও দূরে গেলে আরও উন্মুক্ত আব্‌হাওয়া—চেরী গাছ, কুল গাছ, ঠেকা দেওয়া বড় বড় পুরানো আপেল গাছ আর লম্বা লম্বা পিয়ার গাছ দেখে মনে হয় যে এত উঁচু গাছে পিয়ার ধরে না। বাগানের

এই অংশটা আমাদের সহরের ফলওয়ালীদের দেওয়া হ'য়েছিল—চোর এবং পাখীর হাত থেকে বাগানটা রক্ষা করত একজন অল্পবুদ্ধি চাষা—নিকটেই একটা কুঁড়েতে তার বাস।

ক্রমে ফলের বাগানটা পাত্‌লা হ'তে হ'তে নদীর কাছাকাছি গিয়ে সাধারণ মাঠে পরিণত হ'য়েছে—নদীতেও নানারকম আগাছার জটলা। মিলের বাঁধটার কাছে গভীর জল মাছে পরিপূর্ণ, কাছেই খড়ের ছাদওয়ালা একটা মিলে শব্দ ক'রে কাজ হ'চ্ছিল এবং ভীষণভাবে ব্যাঙ্‌ ডাক্‌ছিল। কাচের মত চক্‌চকে জলের উপরে মাঝে মাঝে বৃত্তাকার চক্র দেখা যাচ্ছিল এবং ধাবমান মাছের সংঘর্ষে জলকুমুদ ন'ড়ে উঠ্‌ছিল। নদীটির অপর পারে ডুবেকনিয়া গ্রাম। শান্ত নীল জল ঠাণ্ডা এবং বিশ্রামের আশায় প্রলুব্ধ করে। এখন এই সবই এঞ্জিনিয়ারের—জল, মিল, এবং নদীটির আরামদায়ক তীর।

এইখানে আমার নতুন কাজ সুরু হ'ল। আমি টেলিগ্রাম আদান প্রদান কর্‌তাম, হিসাব লিখ্‌তাম আর আমাদের অফিসে নিরক্ষর কুলী এবং ফোরম্যানদের দ্বারা প্রেরিত আদেশ, দাবী এবং রিপোর্টের নকল কর্‌তাম। বেশীর ভাগ সময়ই আমি কিছু কর্‌তাম না—টেলিগ্রাফের আশায় পায়চারী কর্‌তাম অথবা অফিসে একটি ছেলেকে পাহারা রেখে বাগানে যেতাম সে যখন এসে খবর দিত যে ঘণ্টা বাজছে তখন অফিসে ফির্‌তাম। মিসেস্‌ শেপ্রাকভের ওখানেই খেতাম। মাংস খুব কমই পেতাম; দুধ দিয়েই বেশীর ভাগ খাদ্যদ্রব্য তৈরী হ'ত—বুধবার এবং শুক্রবারে লেণ্টের (খ্রীষ্টীয় পর্ব) উপযোগী খাবার লেণ্টেন নামক পাটল বর্ণের প্লেটে ক'রে দেওয়া হ'ত। মিসেস্‌ শেপ্রাকভ্‌ সব সময় আড়চোখে তাকাতেন—তাঁর এ অভ্যাসটা বেড়েই চল্‌ছিল এবং আমি তাঁর উপস্থিতিতে নিজেকে বিব্রত বোধ করতাম্‌।

একজনের উপযুক্ত কাজই ছিল না ব'লে শেপ্রাকভ্‌ কিছুই কর্‌তনা—সে ঘুমোত কিংবা হাঁস মারার জন্য বন্দুক নিয়ে নদীতে যেত। সন্ধ্যাবেলায় গ্রামে কিংবা ষ্টেশনে প্রচুর পরিমাণে মদ খেত এবং শুতে যাবার আগে আয়নায় তাকিয়ে বল্‌ত: "আইভ্যান্‌ শেপ্রাকভ্‌, কেমন আছ ?"

মদ খেলে তাকে খুব বিবর্ণ দেখাত—সে হাত দুটি ঘষ্‌তে ঘষ্‌তে হাস্‌ত কিংবা ঘোড়ার মত 'হি-হি-হি' শব্দ কর্‌ত। সে বীরত্ব দেখানোর জন্য পোষাক ছেড়ে উলংগ হ'য়ে মাঠের মধ্যে ছুট্‌ত এবং পোকা ধ'রে খেয়ে বল্‌ত যে পোকাগুলো একটু টক্‌।

(৪)

একদিন বিকালবেলা ও হাঁপাতে হাঁপাতে আমার অফিসে এসে খবর দিল: "তোমার বোন তোমায় দেখ্‌তে এসেছেন।"

আমি বেরিয়ে গিয়ে দেখ্‌লাম বাড়ীর সিঁড়ির কাছে একটা গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে। আমার বোন অ্যানিউটা ব্লাগোভো এবং সৈন্যদলের পোষাক-পরা একটি সামরিক ভদ্রলোককে সংগে ক'রে এনেছিল। আমি একটু এগিয়েই সামরিক ভদ্রলোকটিকে অ্যানিউটার ভাই ডাক্তার ব'লে চিন্‌তে পার্‌লাম।

ডাক্তার বল্‌লেন: "আমরা আপনাকে বন-ভোজনের জন্য নিতে এসেছি; আপনার যদি আপত্তি না থাকে চলুন।"

অ্যানিউটা এবং আমার বোন দুজনেই জিজ্ঞাসা করতে চাইছিল আমার দিন কেমন কাটছে কিন্তু তারা দুজনেই নীরবে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। তারা বুঝতে পেরেছিল যে কাজ আমার পছন্দ হয় নি'—আমার বোনের চোখে জল এল এবং অ্যানিউটা লজ্জায় লাল হ'য়ে উঠ্‌ল। আমরা ফলের বাগানে গেলাম—ডাক্তার চল্‌লেন সবার আগে। তিনি প্রবল আগ্রহে ব'লে উঠলেন: "কি বাতাস! সত্যি কি সুন্দর বাতাস!"

তিনি ঠিক ছোট ছেলের মত দেখ্‌তে। তাঁর কথা বলা এবং চলা ঠিক কলেজের ছাত্রের মত এবং তাঁর চোখের দৃষ্টিও সুন্দর একটি ছেলের মত সজীব, সরল এবং সহজ। তাঁর লম্বা সুন্দরী বোনের তুলনায় তাঁকে দুর্বল এবং সামান্য বলে মনে হ'চ্ছিল—তাঁর দাড়ি পাত্‌লা—গলার স্বরও ক্ষীণ কিন্তু মধুর। তিনি সৈন্যদলের সংগে কোথায় যেন গেছিলেন—বাড়ীতে ছুটিতে আছেন এবং বল্‌লেন যে হেমন্তকালে পিটার্সবার্গে যাবেন এম্, ডি, ডিগ্রী নিতে। তাঁর পরিবার ছিল—স্ত্রী এবং তিনটি ছেলেমেয়ে; বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি যখন দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র তখনই তিনি বিয়ে ক'রেছিলেন এবং লোকে বল্‌ত যে তাঁর দাম্পত্য জীবন নাকি সুখের নয়—তিনি স্ত্রীর সংগে বাস করেন না। "এখন কটা বাজে?" আমার বোন অস্বস্তি অনুভব কর্‌ছিল। "আমাদের শীঘ্রই ফিরে' যেতে হ'বে কারণ বাবা আমাকে সন্ধ্যা ছয়টার পরে বাইরে থাকতে দেন না।" "ওঃ, তোমার বাবা!" ডাক্তার দীর্ঘশ্বাস ফেল্‌লেন।

আমি চা তৈরী কর্‌লাম—সবাই মিলে ছাদের সামনে কার্পেটে বসে চা পান করা হ'ল: ডাক্তার হাঁটু গেঁড়ে ব'সে চা পান করতে করতে বল্‌লেন যে তিনি সম্পূর্ণ সুখী। তারপর শেপ্রাকভ্ চাবি এনে কাচের দরজা খুল্‌লে আমরা সবাই বাড়ীতে প্রবেশ কর্‌লাম।

বাড়ীর ভিতরটা অন্ধকার এবং রহস্যময়—কেমন যেন একটা ভ্যাপ্সা গন্ধ—আমাদের চলায় এমন একটা ফাঁপা শব্দ হ'তে লাগ্‌ল যেন মেঝের নীচটাই ফাঁপা। ডাক্তার পিয়ানোর সাম্‌নে থেমে চাবিগুলো নাড়্‌লেন—একটা মৃদু কম্পমান ভাংগা সুর বেরুলো—তবু কি মিষ্টি সুর। তিনি গলা ছেড়ে একটা প্রেম সংগীত গাইতে লাগলেন—যখনই

কোনো ভাংগা চাবিতে হাত পড়ে তখনই তাঁর মুখে বিরক্তির ছাপ পড়ে—তিনি অধীর হ'য়ে মেঝেয় পা ঠোকেন। আমার বোন বাড়ী যাওয়ার কথা ভুলে' গেল—উত্তেজিত হ'য়ে ঘরময় ঘুরে' বেড়াতে বেড়াতে বল্‌তে লাগল: "আমি সুখী। আমি খুব খুব সুখী।"

তার গলায় একটা বিস্ময়ের সুর যেন, সুখী হওয়াটা তার পক্ষে অসম্ভব। আমার জীবনে এই বোধ হয় আমার বোনকে আমি প্রথম এত আনন্দিত হ'তে দেখলাম। তাকে আমার খুব সুন্দরী ব'লেও মনে হ'ল। তার মুখের রৈখিক আকৃতি মোটেই ভাল ছিল না— দেখলে মনে হ'ত সে সব সময়ই বুঝি নাক ঝাড়ছে কিন্তু তার কালো রঙের চোখ দুটী বড় সুন্দর—গায়ের রঙে একটা বিবর্ণ পেলবতা—মুখের ভাবে ছিল একটা হৃদয় স্পর্শী সদয় বিষণ্ণতা। যখন সে কথা বলত তখন তাকে চমৎকার মানাত এমন কী সুন্দরী ব'লেও মনে হ'ত। সে আর আমি দুজনেই মায়ের মত হয়েছিলাম—বড় কাঁধ, সবল এবং কঠিন কিন্তু বিবর্ণতাটা তার রোগের চিহ্ন। সে প্রায়ই কাস্‌ত এবং তার চোখে আমি অসুস্থ লোকের মত একটা ভাব লক্ষ্য করতাম। তার বর্তমান আনন্দের মধ্যে একটা শিশু সুলভ সরলতা ছিল যেন শিশুকালে কঠিন শাসনের ফলে আমাদের যে-আনন্দ চাপা প'ড়ে ভোঁতা হ'য়ে গেছিল সেই আনন্দ তার হৃদয়ে মাথা চাড়া দিয়ে জেগে উঠেছে এবং মুক্তি পেয়ে বাইরে এসেছে।

কিন্তু যখন সন্ধ্যা হ'য়ে গেল এবং গাড়ীটা আনা হ'ল তখন আমার বোন খুব শান্ত এবং দমিত হ'য়ে গেল—সে গাড়ীটায় এমনভাবে ব'সে রইল যেন সেটা কয়েদীদের গাড়ী। শীঘ্রই তারা সব চ'লে গেল........দূরে গাড়ীর শব্দ মিলিয়ে গেল। আমার মনে পড়্‌ল যে অ্যানিউটা ব্লাগোভো সারাদিন আমার সংগে একটা কথাও বলেনি। "আশ্চর্য মেয়ে!" আমি ভাব্‌লাম। "আশ্চর্য মেয়ে!"

লেণ্ট এল—রোজই আমাদের লেণ্টের খাবার খেতে হ'ত। আমার আলস্য এবং আমার চাকরীর অনিশ্চয়তায় আমি খুব কষ্ট পাচ্ছিলাম ঃ একটা অলস ক্ষুধাত অতৃপ্তি নিয়ে আমি মাঠে ঘুরে বেড়াতাম—শুধু সেই সতেজ মুহূর্তটির অপেক্ষায় ব'সে ছিলাম যখন আমি কাজ ছেড়ে চ'লে যেতে পারব।

একদিন বিকালবেলা র‍্যাডিশ্‌ আমাদের অফিসে ব'সেছিল—তখন অতর্কিতভাবে রোদে পুঁড়ে ধূলায় ধূসর হ'য়ে ডল্‌ঝিকভ্‌ এসে উপস্থিত। তিনি তিনদিন ধ'রে লাইনে বেরিয়েছেন—একটা এঞ্জিনে চেপে ডুবেকনিয়ায় এসেছেন। তিনি গাড়ী আন্‌বার হুকুম দিয়েছিলেন—গাড়ী না আসা পর্যন্ত সরকারের সঙ্গে স্টেট দেখে বেড়ালেন—উঁচু গলায় কি সব আদেশ দিলেন তারপর একঘণ্টা ধ'রে আমাদের অফিসে ব'সে চিঠি লিখ্‌লেন।

যখন টেলিগ্রাম এল তিনি নিজেই তাঁর উত্তর দিলেন—আমরা নির্বাক কাঠিন্যে পাশেই দাঁড়িয়ে রইলাম।

"কি বিশৃংখলা!" তিনি হিসাবের বই দেখে রেগে বল্লেন। "আমি একপক্ষের মধ্যেই অফিস্ ষ্টেশনে নেব—তারপর তোমাদের নিয়ে যে আমি কি করব জানি না!"

"আমি যথাসাধ্য চেষ্টা ক'রে কাজ ক'রেছি স্যার" শেপ্রাকভ্ বল্লে।

"তা'ত নিশ্চয়ই! চোখের উপরই তোমার যথাসাধ্য চেষ্টার নমুনা দেখ্‌তে পাচ্ছি। তুমি শুধু মাইনেই নিতে জানো।" এঞ্জিনিয়ার্ আমার দিকে তাকিয়ে বল্‌তে লাগলেন: "তুমি যথাসম্ভব কম কাজ ক'রে কেবলমাত্র পরিচয়পত্রের জোরেই উন্নতি করতে চাও। এই লাইনে আস্‌বার আগে আমি এঞ্জিন-চালক ছিলাম। আমি বেল্‌জিয়ামে সাধারণ লুব্রিকেটরের কাজ ক'রেছি। আর প্যান্টেলে, তুমি এখানে ব'সে ব'সে কি করছ?" তিনি র‍্যাডিশের দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করলেন। "মদ খেতে যাচ্ছ?"

যে কোন কারণে হোক্ তিনি সব সরল মানুষকেই প্যান্টেলে বল্‌তেন এবং শেপ্রাকভ্ ও আমার মত লোককে ঘৃণা করতেন—আমাদের বল্‌তেন মাতাল, পশু। তিনি স্বভাবত। ছোট কর্মচারীদের ওপর খুব চটা নির্দয়ভাবে কোন কারণ না দেখিয়ে তিনি তাদের মাইনে দিয়ে তাড়িয়ে দিতেন। অবশেষে তাঁর গাড়ী এল। তিনি যাবার সময় আমাদের চৌদ্দদিনের মধ্যে ছাড়িয়ে দেবেন ব'লে প্রতিজ্ঞা ক'রে গেলেন; সরকারকে বোকা বললেন এবং গাড়ীতে আরাম ক'রে নিজের দেহ ছড়িয়ে দিয়ে চ'লে গেলেন।

"আণ্ড্রে আইভ্যানিশ্" আমি র‍্যাডিশ্‌কে বল্‌লাম, "তুমি আমাকে একজন শ্রমিকরূপে নেবে?"

"তা' বেশ ত। এস না!"

আমরা দুজনে সহরের দিকে চল্‌লাম—যখন ষ্টেশন্ এবং গোলাবাড়ী ছাড়িয়ে বহুদূর চ'লে গেছি তখন জিজ্ঞাসা করলাম: "অ্যাণ্ড্রে আইভ্যানিশ্, তুমি ডুবেক্‌নিয়ায় এসেছিলে কেন?"

"প্রথম কারণ আমার কয়েকটি লোক লাইনে কাজ করছে, দ্বিতীয় কারণ মিসেস্ শেপ্রাকভ্‌কে সুদ দেওয়া। আমি গত গ্রীষ্মকালে তাঁর কাছে পঞ্চাশ রুব্‌ল্ ধার নিয়েছিলাম—এখন মাসে মাসে এক রুব্‌ল্ ক'রে সুদ দেই।"

চিত্রকর থেমে আমার কোট ধর্‌ল।

"মিসেল্ অ্যালেক্সিস্, বন্ধু" সে বল্‌ল, "আমার মনে হয় যে যদি কোন সাধারণ লোক কিংবা ভদ্রলোক সুদ নেয় তবে সে অন্যায় করে। তার মধ্যে সত্য ব'লে কিছু নেই।"

পাত্‌লা, বিবর্ণ এবং ভয়ংকর চেহারার র‍্যাডিশ্ চোখ বুঁজে মাথা নেড়ে বিড়্‌বিড়্ ক'রে তার দার্শনিক তথ্য ব'লে চল্‌ল: "পোকায় ঘাস খায়, মরিচায় লোহা খায় আর অসত্য মানবাত্মাকে ধ্বংস করে। হতভাগ্য পাপী আমাদের ভগবান রক্ষা করুন।" (ক্রমশ)

দেশ বিদেশের চলচ্চিত্র

গো. চ. রা.

ফরাসী দেশের কথা

ভাব ও ভাষার প্রতীক আধুনিক জগতে নানা রূপ ধারণ করিয়াছে—চলচ্চিত্র এ বিষয়ে তার একটি অভিনব স্বাতন্ত্র্যও স্থাপিত করিয়াছে—যে স্বাতন্ত্র্য বর্ত্তমান মানুষের অনুগামীরা হয়ত বা আরও উন্নত ভাবে অথবা অবনত ভাবে দেখিতে পাইবে। এমন কি তার লুপ্তাবস্থায়, আফ্রিকার ম্যমীর অথবা মহেঞ্জোদাড়োর স্থাপত্যের মত, বিশেষ গবেষণার বিষয় হইয়া দাঁড়াইতে পারে আধুনিক চলচ্চিত্রের সকল অঙ্গই। দূর ভবিষ্যতের গভীর অন্ধকার প্রদেশে যে প্রহেলিকা লুকাইয়া আছে তাহা মানুষকে যতটা না উৎসাহিত করে তদপেক্ষা অধিক আগ্রহের বস্তু মানুষ মনে করে তার বর্ত্তমানকে; বর্ত্তমানের রঙ্গমঞ্চে যে নাটক অহর্নিশ অভিনীত হইতে দেখে তাহাতেও সে হয় না সন্তুষ্ট, সে চায় এ বাস্তব অভিনয়কে আরও সুন্দর করিতে, রমণীয় করিতে—আরও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিতে। স্বল্প পরিসরের মধ্যে বৃহৎ বা অসীমকে সে চায় উপলব্ধি করিতে, তাই সে ক্ষুদ্র পরিসরে বৃহৎ ইতিহাসকে রচনা করে, বৃহৎ জীবন-লীলাকে রূপান্তরিত করে। রবীন্দ্রনাথ ছবি আর গানের সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়াছেন এইরূপ: "অসীম যেখানে সীমার মধ্যে, সেখানে ছবি। অসীম যেখানে সীমাহীনতায়, সেখানে গান।" স প্রেয়কে, শ্রেয়কে সে করিতে চায় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য—তাই। সে গড়ে মূর্ত্তি, তাই সে তাকে করে বেশভূষায় সজ্জিত, চন্দনে চর্চ্চিত, পুষ্প-বিল্বপত্রে পূজিত। এইভাবে বৃহৎকে ক্ষুদ্রে দেখিতে যেমন তার আগ্রহ, ক্ষুদ্রকেও সে তেমনি বৃহৎ করিতে ব্যগ্র। মনের এই দোটানাই মানুষের জীবনকে দেয় একটা গতি—যে গতি নিরবিচ্ছন্ন নয়, যে গতি সর্ব্বদা স্পন্দনরত নৃত্যশীল! রস-রসনায় কখন সে কাব্যে, কখনও সে সাহিত্যে, কখন সে সঙ্গীতে, কখন সে নাটকাভিনয়ে, কখনও সে চলচ্চিত্রে আপনার রূপ আপনি ধরিতে চায়, বিফল হয়, আবার নূতন ভাবে প্রয়াস পায়—কোন ভাবেই ধরা কিন্তু সে পড়ে না। আধুনিক কালে মানুষ চলচ্চিত্রের যে কৌশল শিখিয়াছে সেই নূতন ফাঁদে নিজে ধরা পড়ে কি না সে দেখিতে চায়।

চলচ্চিত্র মানুষকে এখন পাইয়া বসিয়াছে। এ অভিনব কৌশল তার একটি বড়

সহায়– যার সাহায্যে সে অল্প পরিসরে তার বৃহৎ-সত্তার অনুভূতিকে উপলব্ধি করিতে পারে কিনা এ পরীক্ষায় সে এখন অতীব ব্যস্ত। কালের লীলা এমনই বিচিত্র যে সে স্থান ও পাত্রের ভেদাভেদ করে না। তাই বুঝি এ-কালে এমন দেশ নাই, মনুষ্য সম্প্রদায়ের এমন জাতি নাই যেখানে আর যাদের মধ্যে চলচ্চিত্রের উন্মাদনা না প্রকটিত দেখা যায়। এ লীলার পরিসমাপ্তির পর আবার কোন লীলা মানুষকে এমনি ভাবে আত্ম-অন্বেষণে পাগল করিবে সে কথা মানুষ জানে না। না জানিলেও মানুষের চলে—সে বর্ত্তমানকে ধরিয়া থাকিতে থাকিতে ধীরে ধীরে ভবিষ্যতের কবলে আবার হয় আত্মহারা। যেমন বিভিন্নতা আছে বর্ত্তমানে আর ভবিষ্যতে, তেমনি বিভিন্নতা আছে বর্ত্তমানের মধ্যেই। তেমনি বিভিন্নতা আছে বিভিন্ন দেশের প্রাকৃতিক শোভায়, তেমনি বিভিন্নতা আছে বিভিন্ন দেশের জীব সকলের অঙ্গ সৌষ্ঠবে, রুচিতে, আচার ব্যবহারে, পৌর-শাসনে, রাষ্ট্রব্যবস্থায়—তেমনি বিভিন্নতা আছে মানুষের চরিত্রে, তার অন্তরের বাণীতে। বর্ত্তমান মানুষের এই সমগ্র বিভিন্নতারই ছায়া পরিস্ফুট হয় বিভিন্ন দেশের অভিনয়ে ও চলচ্চিত্রে।

ফরাসী দেশের চলচ্চিত্রে ফরাসীদের বৈশিষ্ট্যের ছাপ আছে কতটুকু এ প্রশ্নের উত্তর ফরাসীরা যতটা জানে তার অপেক্ষা বেশী জানে বিদেশীরা। ফরাসীরা তাদের যতটা না চেনে তার অপেক্ষা বেশী চেনে তাদের বিদেশীরা। তার চলা-ফেরায়, কথায়-বার্ত্তায় সে কতটা ফরাসী তা ফরাসী নিজে ধরিতে পারে না—যতটা পারে বিদেশীরা। বিদেশী চোখেই জাতীয় বৈশিষ্ট্যের সবটুকু দোষ, সবটুকু গুণ প্রকাশ পায়।

ফরাসী দেশে বসুন্ধরা বন্ধ্যা নন, সে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ যা আছে তার সাথে প্রকৃতিরই সন্তান মানুষের কর্ম্ম-কুশলতা সুন্দরভাবে যুক্ত হইয়া সে দেশকে খাদ্য সামগ্রীতে করিয়া তুলিয়াছে বহুলাংশে স্বাবলম্বী। যাহাকে পরমুখাপেক্ষী হইতে হয় নাই—তাহার চরিত্রে যে স্বাতন্ত্র্য উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? এই বৈশিষ্ট্য দেখা দিয়াছে ফরাসী-চলচ্চিত্রেও।

জাতি হিসাবেও ফরাসীরা একটা গোষ্ঠি রচনা করিয়া রহিয়াছে। জাতীয় স্বাতন্ত্র্য তাদের বুদ্ধিমত্তা, তাদের রুচি, তাদের সৌন্দর্য্য-জ্ঞান ও সৃষ্টি ক্ষমতার উপর একটি গভীর ছাপ রাখিয়াছে। ফরাসীদের সৃষ্টি-কুশলতার প্রধান লক্ষণ সমষ্টিগত নয়, ব্যষ্টিগত। শিল্প নিষ্ঠার ঢেউ আসিলেও তাদের মধ্যে এ লক্ষণের ব্যতিক্রম হয় নাই। তাদের মনোহারী পণ্য সামগ্রী এখনও বিদেশীদের কৌতূহল উদ্রেক করে। ফরাসীদের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সৃজন-কুশলী আছে অগণিত। দক্ষিণের অপেক্ষাকৃত উষ্ণ প্রদেশে এরূপ সৃজন কুশলীর সংখ্যা অধিক। অপর দিকে দেশটি কৃষি প্রধান বলিয়া ফরাসীবাসী স্ত্রীপুরুষেরা অপর শিল্প-প্রধান দেশের

নরনারী অপেক্ষা দ্রুততায় ও চাঞ্চল্যে ততটা অভ্যস্ত নয়। বৃহদাকার শিল্প সে দেশে পত্তন না হওয়ায় কাঁচ-শিল্প বা লেন্স-শিল্প, তেমনি রাসায়নিক-শিল্প বা ফিল্ম-শিল্প ও বৈদ্যুতিক বা শব্দ-শিল্প ইউরোপের এ বিষয়ে অগ্রগামী অপর কয়েকটি দেশের মত বা আমেরিকার মত তেমন বৃহদাকারে গড়িয়া উঠে নাই এবং এ দুই বিষয়ে সে স্বাবলম্বী হইতেও পারে নাই।

ফরাসীদের এই সকল বৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তাদের চলচ্চিত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় যে ফরাসী চলচ্চিত্রে এই সকল গুণ বা দোষও স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য যা জাতীয় চরিত্রে পরিস্ফুট, তাহাই ফরাসীদের চলচ্চিত্রের অভিযানে সমষ্টিগত চেষ্টার ব্যতিক্রম ঘটাইয়াছে। ফরাসী পরিচালকেরা স্বয়ং-প্রাধান্যই বেশী পচ্ছন্দ করেন। কোনরূপ জাতীয় পরিকল্পনার অধীনস্থ না হইয়া, যথায় তথায় চলচ্চিত্র-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা এবং চিত্রের বিষয়-বস্তু নির্ব্বাচনে একটি প্রতিষ্ঠানের সহিত অপর প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা না করা ফরাসীদের জাতীয় চরিত্রের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যেরই প্রতিচ্ছবি। কোন না কোন এক-ব্যক্তিই এক একটি প্রতিষ্ঠানের প্রাণ স্বরূপ, তিনি নিজের সৌন্দর্য্য-জ্ঞান ও কর্ম্ম-কুশলতার মাত্রা লইয়াই সন্তুষ্ট এবং তাঁহার একক-রূপসৃষ্টিই জাতীর আসরে পরিবেশন করিয়া পরিতুষ্ট—তাহাতে সমাজের প্রতি দর্শক এবং শ্রোতার প্রতি সুবিচারের যে মূল উদ্দেশ্য রহিয়াছে তাহা একক-বুদ্ধি বিবেচনায় সাধিত হইল সেদিকে স্বভাবতই লক্ষ্য থাকে কম। ক্লেয়ার, ফেদার, এপস্তিন, গ্রেয়ার প্রভৃতি যশস্বী পরিচালকেরাও এ বৈশিষ্ট্য হইতে পরিত্রাণ পান নাই। পটুয়া-শিল্পী ও চিত্রকরেরা একক-সাধনায় যশস্বী হইয়াছেন ফরাসী দেশে অনেকে—কিন্তু চলচ্চিত্রের ও স্থির-চিত্রের সাধনায় যে পার্থক্য রহিয়াছে তাহা ফরাসী চলচ্চিত্রকরেরা মানিয়া লইতে পারেন নাই।

কৃষি প্রাধান্যের হেতুতে জাতীয়-চরিত্রে যে শ্লথভাব আনিয়া দেয় তাহাই বুঝি ফরাসী চলচ্চিত্রেও অভিব্যক্ত হইয়াছে। নাটকীয় অভিব্যক্তি, চাকচিক্য ও আড়ষ্টতা ফরাসী চলচ্চিত্রে স্থান পাইয়াছে যেরূপ, ইউরোপের অপর অগ্রগামী দেশে সেরূপ পাইবার অবকাশ পায় নাই। একটানা দৃশ্য সে সকল দেশে অতীতের সামগ্রী হইলেও ফরাসী দেশে তাহার প্রচলন রহিয়া গেল। ফরাসী দেশে বৃহদাকারে শিল্পনিষ্ঠা পত্তন না হওয়া এবং কাঁচ-শিল্প বা রাসায়নিক-শিল্প বা বৈদ্যুতিক-শিল্প গড়িয়া না উঠিবার ফলে চলচ্চিত্র উৎপাদনের সামগ্রী সে দেশে দুর্মূল্য, তাই প্রচুর অর্থ প্রয়োজন হয় বৃহদাকার এবং উৎকৃষ্ট প্রকারের চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে, অথচ কৃষিপ্রধান দেশ বলিয়া এমন বৃহৎ প্রতিষ্ঠান গড়িবার মত প্রচুর অর্থেরও যথেষ্ট অভাব রহিয়া যায়। চলচ্চিত্র উৎপাদনের সামগ্রী দুর্মূল্য বলিয়া নূতন

নূতন পন্থা ও পদ্ধতি আবিষ্কারের জন্য যে অপচয় প্রয়োজন তাহাও ব্যয়সাধ্য—এজন্য অন্যত্র পরীক্ষিত ও অপরের-গৃহীত পদ্ধতির অনুকরণ ফরাসী চলচ্চিত্রে অপরিহার্য্য হইয়া পড়িয়াছে এবং ফরাসী শিল্পী চলচ্চিত্রের-কৌশলে নূতন অবদান কিছু করিয়া উঠিতেও পারে নাই।

যদিও ফরাসীরা তাদের চলচ্চিত্রের মধ্য দিয়া নিজের ত্রুটি বিচ্যুতিই ফুটাইয়া তুলিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই, তথাপি অপর দেশের মতই নিজেকে তাহারা তাদের চলচ্চিত্রের মধ্যে ধরিতে পারিতেছে কিনা বা পারিবে কিনা তাহাতে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

ইসাডোরার নৃত্যরচনা

অনিলবরণ চৌধুরী

১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে ইসাডোরা ডানকান নৃত্যজগতে নূতন শক্তি, নূতন ভাব ও অদম্য গতিবেগ নিয়ে আবির্ভূত হলেন এবং তার পরে নৃত্য-রসিক জগৎ বর্ত্তমান নৃত্যকলা ও নূতন ব্যালে নৃত্যকে লাভ করলো। বর্ত্তমান যুগের নৃত্যকলা ডানকানের ভাবাবেগ-বহুল ইঙ্গিত পূর্ণ নৃত্য-কলার বিরোধী ও সম্পূর্ণ বিপরীত-ধর্ম্মী বলে যে ধারণা প্রচলিত আছে, ডানকানের রচিত প্রবন্ধ পাঠ করলেই বুঝা যাবে যে, এই ধারণা নিতান্ত অমূলক। শুধু তা' নয় ডানকান যে তার সমসাময়িক ও ভবিষ্যৎ নৃত্যকলার পথ প্রদর্শন করে গেছেন তা'ও প্রমাণিত হবে। ডানকান তাঁর মতবাদকে চুলচেরা বিশ্লেষণ করেন নি; বরং তাঁর পরবর্ত্তী নৃত্যবিদ্‌গণই বিশেষ-ভাবে তা' করেছেন। তবে ডানকান যে সাহিত্যের আকারে তাঁর প্রতিভার মূলকথাটার গোড়াপত্তন করে গেছেন,—বিদগ্ধ-সমাজ তা'তেই সন্তুষ্ট।

নৃত্য যে শুধু বিলাসের সামগ্রী, অবসর-বিনোদন বা ইন্দ্রিয়-চরিতার্থ করবার উপায়-স্বরূপ কিংবা কর্ম্মক্লান্ত মানুষের শ্রান্ত অঙ্গ সঞ্চালনের আনুষঙ্গিক উপায় মাত্র নয়, ডানকান তা' প্রমাণ করে গেছেন। গ্রীক সভ্যতা নৃত্যকলাকে উর্দ্ধে স্থান দিতো; মানুষের সুকুমার বৃত্তিগুলিকে উদ্বুদ্ধ করবার জন্য যে সমস্ত সুচারুকলা তখনকার গ্রীক সভ্যতায় প্রচলিত ছিল; নৃত্য তাদের মধ্যে অন্যতম। নৃত্যকলা শ্রেষ্ঠ আর্টের সমপর্য্যায় ভুক্ত। ইসাডোরা গ্রীক-সভ্যতার অভিমত ও প্রচলিত ধারণাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন। তাঁর The Art of the Dance গ্রন্থে তিনি বলেছেন—"নৃত্য প্রমোদ এবং অবসর সময়ে চিত্তবিনোদনের জন্য নয়, ইহা ধর্ম্ম, ইহা জীবনের গভীর অর্থ-দ্যোতক। জীবন হচ্ছে মূল শিকড়, আর আর্ট হচ্ছে তার ফুল।"

নৃত্য শুধু নিছক অঙ্গভঙ্গী নয়, ইহার সৃষ্টি করার যথেষ্ট শক্তিও রয়েছে। অঙ্গচালনা শুধু অঙ্গ-চালনা কিংবা দেহভঙ্গীর জন্যই নয় এবং দেশ-কাল-পাত্র হিসেবে কৌশলের বাজী-দেখানও নয়; এর উদ্দেশ্য রয়েছে আরও বৃহৎ এবং সে উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রকাশ, কোন বস্তুর প্রকাশ। দেহের অনুশীলন ও উৎকর্ষ সাধন ব্যায়াম-গীরের উদ্দেশ্য, কিন্তু নৃত্যের পক্ষে তা' উপায় মাত্র। দেহকে ভুলে যেতে হবে; কারণ এ একটি সঙ্গতিবিশিষ্ট ঐক্যতান পূর্ণ যন্ত্রবিশেষ,

যার অনুরণন কেবল মাত্র দেহভঙ্গী নয়—বরং আত্মার আবেগ ও ভাবাকুল ঝঙ্কার। দেহের পথ দিয়েই সুদূর অধ্যাত্ম রাজ্যে পোঁছাতে হয়, কিন্তু অধ্যাত্ম-পথে যাত্রার সময় দেহের কথা মনে থাকলে চলবে না। আত্মার সঙ্গীত দেহের বীণায় ঝঙ্কার তোলে, সারা দেহ সুরে সুরে ভরে উঠে—এবং নৃত্যেই তার পরিণতি হয়।

ব্যালে নর্ত্তকদের দৈহিক লীলা ইসাডোরো অপেক্ষা অনেক বেশী উন্নত ছিল। তারা শুধু ইসাডোরা অপেক্ষা অধিক উল্লম্ফন করতে পারতো তা' নয়, শূন্যে অদ্ভুত সব বাজী ও কলা-কৌশল দেখাতে পারতো। তাদের উদ্দেশ্য ছিল শুধু কৌতুক দেখিয়ে কলা কৌশল দেখিয়ে দর্শককে তাক্ লাগানো। ডানকানের মতবাদ কিন্তু ভিন্ন-প্রকারের ছিল; তাঁর মতে অঙ্গলীলা প্রাকৃতিক শক্তিনিচয় ও নৃত্যকারীর নিবিড় সংযোগেরই ফল। সুউচ্চ আধ্যাত্মিক অনুভূতির পথে এই অঙ্গপরিচালনা উপায়-স্বরূপ এবং প্রথম সোপান মাত্র।

ডানকান ভাবাবেগ-প্রবণ আত্মপ্রচার-মূলক নৃত্যের প্রচলন করেন বলে একটা অমূলক অপবাদ রয়েছে। তাঁর লেখাতে দেখা যায়, তিনি নূতন নৃত্যকে আর্টের ভঙ্গীতে গড়তে চেয়েছেন এবং আবশ্যকমত তার সুসংযত অবয়ব বা আকার দিয়েছেন,—নৃত্য রচনায় কোন বস্তুকেই অদৃষ্টবাদের দিকে ঠেলে দেননি। "বিশ বৎসর আমি আমার আর্টের জন্য অনবরত কঠোর পরিশ্রম করেছি এবং বেশীর ভাগ সময়ই শিল্পনৈপুণ্য শিক্ষার জন্য"। ইসাডোরার একথাটি সত্য; ইসাডোরা শিল্পনৈপুণ্য ব্যবহার করেছিলেন সত্য; কিন্তু তা' প্রকাশ—ভঙ্গীর উপায় এবং যন্ত্রস্বরূপই ছিল। এমনি করে ব্যালের অঙ্গ-কলাকৌশলের ধারণা ধ্বংস হলো; তার জায়গায় নূতন টেকনিকের উৎকর্ষ সাধন হলো।

ইসাডোরা অঙ্গসঞ্চালনের ভিতর দিয়েই সেই প্রকাশ ভঙ্গীর উপলব্ধি খুঁজেছিলেন। ব্যালে মুক অভিনয়ের সাহায্যে ভাবাবেগ কিংবা কোন তত্ত্ব প্রকাশ করতো এবং নৃত্য তাতে খণ্ড খণ্ড অভিনয়ের মধ্যে যোগ-সূত্রের মত ব্যবহৃত হতো। সর্ব্ব প্রথম ইসাডোরাই নৃত্যকারীর বার্ত্তা জ্ঞাপন করবার জন্য নিরবচ্ছিন্ন অঙ্গভঙ্গীকে কাজে লাগালেন, এবং অঙ্গভঙ্গী ও সর্ব্বাঙ্গ সঞ্চালনই নৃত্যের সম্পূর্ণ মাপকাঠি হয়ে দাঁড়াল। নৃত্যে আর গল্প বলার প্রয়োজন থাকলো না। সুরজ্ঞ যেমন সুর বাঁধতে পারেন, ইসাডোরাও তেমনি স্বাধীনভাবে নৃত্য রচনা করতে আরম্ভ করলেন। পূর্ব্বে ব্যালে কোন ভাবধারার শুধু বাস্তব চিত্রাঙ্কনেই সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু ডানকান ভাবাবেগের চুম্বকটি প্রকাশ করতেও সমর্থ হলেন।

এমনি করে নৃত্য-জগতে যে একটা আলোড়ন সৃষ্টি করে ইসাডোরা যে সমস্ত তথ্য প্রতিষ্ঠিত করে গেলেন তা'র প্রভাব পরবর্ত্তী নৃত্যকারগণ অস্বীকার করে উড়িয়ে দিতে পারেন নি। ইসাডোরা যে বীজ বপন করে গেলেন ডিয়াগিলেফের সময়ে তা' পত্রে পুষ্পে সুশোভিত

হয়ে উঠলো। ফোকিন আপাততঃ আপত্তি করলেও পরে ইসাডোরার দানকে অস্বীকার করতে পারেন নি ; শেষে স্বীকার করে গিয়েছিলেন যে ব্যালের উপর ডানকানের অসাধারণ প্রভাব তাঁর ভিতর দিয়ে সঞ্চারিত হয়েছিল। নিজিনস্কি, উইগ্‌ম্যান, গ্রাহাম, কার্ট, জুস্ প্রভৃতিকে বর্ত্তমান নৃত্য এবং নৃতন ব্যালে সম্বন্ধে ইসাডোরার নিকট ঋণ স্বীকার করতে হয়েছে। ডানকান সম্পূর্নরূপে ব্যালেকে অগ্রাহ্য করেছিলেন ; ফোকিন ডানকানের বিদ্রোহী মন নিয়ে ব্যালেকে নতুন ভাবে প্রতিষ্ঠিত করলো ; ব্যালের যা প্রধান গুণ ছিল নিজিনস্কি তা' রক্ষা করলো এবং শিল্পীজনোচিত মনোবৃত্তি নিয়ে তাকে আর্টের আকারে সৃষ্টি করলো।

ইসাডোরার কথা দিয়েই বর্ত্তমান নিবন্ধ সমাপ্ত করবো। ইসাডোরা বলেছেন :— "ভাবী নৃত্যকার হবে এমন এক ব্যক্তি যার দেহ ও আত্মা এমন সুসঙ্গত ভাবে গড়ে উঠবে যে তার আত্মার প্রকৃত বাণী হবে তার প্রত্যেক অঙ্গভঙ্গী। নৃত্যকার শুধু কোন নির্দ্দিষ্ট জাতীর হবে না—সে হবে সমগ্র মানবজাতির। সে বুদ্ধি ও অধ্যাত্মবাদের অপূর্ব্ব সংযোগ সাধন করবে।" [Blanche Evanএর Road to Danceএর ছায়াবলম্বনে।]

শিল্প সাধনা

ম. চ.

পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্রই যখন রুদ্রনৃত্য সুরু হ'য়েছে তখনও যে এদেশে নৃত্যকলার প্রতি অনুরাগ অক্ষুন্ন রয়েছে তা'তে কেউ কেউ বিস্মিত হয়েছেন ও জ্বলমান রোমের প্রতি নীরোর উপেক্ষার কথা স্মরণ করেছেন। কিন্তু ললিত কলার প্রতি মানুষের স্বাভাবিক একটা আকর্ষণ আছে—অন্ততঃ থাকা বাঞ্ছনীয়। যেখানেই তার অভাব ঘটেছে সেখানেই মানুষের দানবীয় প্রবৃত্তির সংঘাতে কৃষ্টি, ঔৎকর্ষ, শিক্ষা সংস্কৃতি ধ্বংশ লাভ করেছে। তাই যখন দেখি এই দুর্দ্দিনেও ও এই দুঃস্থ দেশেও উপর্য্যুপরি একাধিক নৃত্যকলাবিদ নানা স্থানে ভ্রমণ করে তাঁদের বিভিন্ন সাধনার অভিব্যক্তি প্রদর্শন করে খ্যাতি ও শ্রদ্ধালাভ করেছেন তখন মনে হয় সহস্র সঙ্কট বিপদ পাতের মধ্যেও বোধ হয় আজও ভারতের অন্তরে অন্তরে কৃষ্টির আলোক অধ্যাত্ম অন্তর্দৃষ্টি স্তিমিত হয়নি। আজও বোধ হয় আমরা বাহিরের ঝঞ্ঝা ঝাপ্টার ঊর্দ্ধে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে ভুলিনি।

উদয়শঙ্করের কথা স্বতন্ত্র। তাঁর নৃতকলার অভিব্যক্তি দেখে মোহিত হয়না এরূপ মানসিক অন্ধতা অন্ততঃ এই ভাব-প্রবণ দেশে আছে বলে মনে হয় না। কিন্তু সম্প্রতি শ্রীযুক্ত হরেন ঘোষের উদ্যোগে চিত্রজগতের স্বনামধন্যা শ্রীমতী সাধনা বোস ভারতের নানা স্থানে তাঁর নৃত্যকুশলতা দেখিয়ে যথেষ্ট খ্যাতি ও সম্মান নিয়ে ফিরেছেন। আর সুখের বিষয় এই যে খ্যাতনামা অভিনেত্রী হিসাবে তিনি এইবার ভারতের স্থানে স্থানে সম্মানিত হন নাই —নৃত্যকুশলা, নৃত্যকলায় অকৃত্রিম সেবিকা হিসাবেই তাঁর খ্যাতিলাভ হয়েছে। সুখের বিষয় এইজন্য যে এদেশে বিখ্যাত অভিনেতা ও অভিনেত্রী সম্বন্ধে একটা অন্ধমোহ আছে— তাঁদের খ্যাতির ভিত্তি বিশ্লেষণ করা, তাঁদের শিক্ষা দীক্ষা সম্বন্ধে বিচার করা এই মনোভাবের যেন অভাব দেখা যায়। আমরা বিভিন্ন স্তরের রূপকারকে পেলেই যেন একই স্তরের ব'লে ধরে নিই। তাঁদের কলা নৈপুণ্য, তাঁদের উৎকর্ষ,তাঁদের অক্লান্ত সাধনা সম্বন্ধে আমরা অনেক সময় উদাসীন। কিন্তু আমরা ভুলে যাই যে শিল্প শিল্পীর চেয়ে বড়।

সাধনা বোসের সঙ্গে গিয়েছিলেন অপূর্ব্ব সঙ্গীত-শিল্পী তিমিরবরণ ও তাঁর যন্ত্রীদল, মালাবারের দুইটি নৃত্যকুশলা শিল্পী, মহারাষ্ট্রীয় বাঙ্গালী আরও দুইটি মহিলা শিল্পী ও কলা

মণ্ডলের দুইটি কৃতী শিষ্য মাধব মেনন ও জয়শঙ্কর। এই শিল্পী নির্ব্বাচনের মধ্যেও শ্রীমতী সাধনা বোস যে অভিজ্ঞতা ও instinctএর পরিচয় দিয়েছেন তার প্রশংসা না করে পারি না। যদিও ভারতনাট্য, মুদ্রা প্রভৃতি নৃত্যকলার প্রকৃষ্ট অভিব্যক্তি সন্দেহ নাই কিন্তু ভারতের এই সমস্ত অমূল্য সম্পদ এতদিন সাধারণ লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকায় অবিমিশ্র ভাবে তা' সম্ভোগ করতে সাধারণ লোকে এখনও সক্ষম হয় নাই। অথচ এই সমস্ত শিল্পী-দের দেশ ভ্রমণের উদ্দেশ্যই হোল ভারতের নৃত্যকলা সম্বন্ধে লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট করা। আমাদের দেশে শিল্প সাধনার উদ্দেশ্য কোন দিনই অর্থ সঞ্চয় করা ছিল না—আজও তার ব্যতিক্রম হ'লে দুঃখের বিষয় হ'বে সন্দেহ নাই।

সাধনা বোসের নৃত্য শাস্ত্রীয় নৃত্যকলা ও আধুনিকতার একটি উপভোগ্য সংমিশ্রণ। এই কারণে দক্ষিণ ভারতের মত শাস্ত্রীয় নৃত্যকলার কেন্দ্রেও তাঁর নৃত্য কুশলতা বিশেষ সমাদর লাভ ক'রেছে। সুদূর দাক্ষিনাত্যেও তিনি বিশেষ সমাদৃতা হ'য়েছিলেন। বাঙ্গালার বাহিরে ভারতের স্থানে স্থানে আজও বাঙ্গালীর কৃষ্টি, বাঙ্গালীর শিল্প কুশলতা বাঙ্গালীর ভাব-প্রবণ বৈশিষ্ট্য কিরূপ আদৃত, চিন্তা ক'রলে শ্লাঘা হয়। অথচ আমরাই আজ ক্ষুদ্র সাম্প্র-দায়িকতা, ক্ষুদ্র স্বার্থ নিয়ে এতই মত্ত হ'য়ে আছি যে ভারতের এই শ্রদ্ধাঞ্জলির প্রতি আমাদের দৃষ্টি নাই।

বোম্বাই, মান্দ্রাজ, মহীশূর, বাঙ্গালোর, হায়দ্রাবাদ প্রভৃতি নানান স্থানে শ্রীমতী সাধনা বোস ও তাঁহার দল গিয়েছিলেন। সর্ব্বত্রই তাঁরা উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ও খ্যাতিলাভ করেছেন। অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি তাঁর নৃত্য দেখে বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করেছেন ও তাঁকে পুনরায় ঐ সকল স্থানে নৃত্য প্রদর্শন করার জন্য সাদর আহ্বান জানিয়েছেন। আরও একটা জিনিষ সাধনা বোসের ভারত পরিভ্রমণে লক্ষ্যিত হয়েছিলো। ভারতের নানান স্থানে বাঙ্গালার সঙ্গীতকলা সম্বন্ধেও যথেষ্ট সানুরাগ কৌতূহল আছে। কিন্তু নৃত্যকলার অভি-ব্যক্তি সঙ্গীতকলার চর্চ্চার সম্যক সুযোগ নয় ব'লে আমাদের বিশ্বাস। আমাদের নিশ্চয় বিশ্বাস যে শুধু সঙ্গীত শিল্পী কোনও দল ভারত পরিভ্রমণ ক'রলে তাঁরা বিশেষ সমাদৃত হবেন।

পরিচয়

গ্রন্থ

উপলা—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বাংলা কাব্য পরিচয়ে' গদ্যকবিতার স্থান দেননি, এর কারণ দেখাতে যেতে তিনি বলেছেন, সে কাব্যের ভাণ্ডার অতি সঙ্কীর্ণ, তার থেকে বাছাই ক'রে নেওয়া সহজ নয়। একালের পাক ধরার সময় এখনও আসেনি, তার জন্ম অপেক্ষা করতে হবে।"

বাংলা সাহিত্যে গদ্যরীতির কবিতার প্রথম প্রবর্তক রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং, এবং তার পরেই নাম করা যায় প্রেমেন্দ্র মিত্রের। রবীন্দ্রনাথ ও প্রেমেন্দ্র মিত্র-নির্দ্দিষ্ট পথে আজ পথিকের অন্ত নেই, তবুও গদ্য কবিতায় এখনও 'একালের পাক ধরেনি'। তার কারণ গদ্য কবিতা লিখতে হ'লেও যে সত্যকার কবিপ্রতিভা ও কবিদৃষ্টির প্রয়োজন, এ সত্য তাদের মধ্যে খুব অল্পজনেরই জানা আছে। তাই এক্ষেত্রে সফলতা লাভ ক'রেছেনও অল্প কয়েকজন মাত্র। আর এই অল্প কয়েকজন ভাগ্যবানের মধ্যেই নিঃসংশয়ে নাম করা যেতে পারে, প্রবীণ কবি সুরেন্দ্রনাথ মৈত্রের। সত্যিকারের কবিপ্রতিভা তাঁর আছে, সেইজন্য সাহিত্য সাধনা যদিও তাঁর আরম্ভ হ'য়েছে দেরীতে, তবুও খ্যাতিলাভ কোরতে তাঁর দেরী হয়নি।

আলোচ্য বই "উপলা" তাঁর নানাজাতীয় গদ্যকবিতার সমষ্টি। কবিতাগুলি সবই যে খুব উঁচুদরের হ'য়েছে তা নয়, কিন্তু এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য শ্রীযুক্ত মৈত্রের কবিতায় আছে যে তার জোরে এরা পাঠকের মনে একটা বিশেষ ছাপ রেখে যেতে সমর্থ হয়। শ্রীযুক্ত মৈত্রের কবিতার সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সহজ সরল ভাবের বিলাস। সাধারণ জীবনের ছোট খাটো ঘটনার মধ্যে দিয়ে জীবনের যে সব গভীর সত্য প্রকাশ পায়, তাদেরই কবি তার অন্তরদৃষ্টির বলে অনুভব কোরে ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর কবিতার মধ্যে। সেইজন্যই তাঁর কবিতার ভাব মনকে "শুধু বিলসিতই করেনা, তাহার চিন্তা ও বুদ্ধিকেও নিগূঢ়ভাবে উদ্দীপ্ত করিয়া তোলে"।

মানুষের জীবনে সুখের আকাঙ্খাই সবচেয়ে বড়ো আকাঙ্খা, কিন্তু সুখের আশায় যে 'বিপুল সঞ্চয়ন' সে জমা করে, তার 'পুঞ্জভারে চাপা পড়ে মরে রুদ্ধ আত্মা' অথচ প্রকৃতির দে'য়া যে অজস্র সুখের উপকরণ রয়েছে তার জীবনে সে দিকে তার দৃষ্টি যায় না।

ভুলত্রুটি মানুষমাত্রেরই হয়, কিন্তু আমাদের সমাজব্যবস্থার গুণে, সামাজিক বিধির কঠোর অনুশাসনের ফল ভোগ ক'রতে হয় মেয়েদেরই বেশী, পুরুষ শুধু 'পুরুষ' বলেই নিষ্কৃতি পেয়ে যায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই। এই কঠোর অপ্রিয় সত্যই প্রকাশ পেয়েছে কবির 'আত্মকাহিনী' ও 'কর্ণকুন্তীসংবাদ' কবিতা দুটিতে।

সবগুলি কবিতার বিস্তৃত বিশ্লেষণ সম্ভবপর নয়। কিন্তু 'উপলার' অধিকাংশ কবিতাই যে ভাব-বৈচিত্র্যের দ্বারা সুধীজনের মনহরণ ক'রবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ভাষার মধুর 'ঝঙ্কার' ভাবের অতলস্পর্শী গভীরতা হয়তো এদের নেই, তার পরিবর্তে আছে হৃদয়ের গভীর সহানুভূতি বোধ ও সাধারণের মধ্য দিয়ে অসাধারণকে দেখাবার প্রচেষ্টা। এরই জন্যে রসের বিচারে শ্রীযুক্ত মৈত্রের কবিতার স্থান হবে অনেক ওপরের দিকেই, নীচের দিকে নয়।

গায়ত্রী রায়

ব্রহ্মপ্রবাসে—শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত, প্রকাশক—সংহতি পাব্লিশিং হাউস্, ৭নং মুরলীধর সেন লেন্, কলিকাতা। দাম—পাঁচসিকা।

আধুনিক বাংলার শ্রেষ্ঠ উপন্যাসিক পরলোকগত ডাঃ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জীবন যেমন রহস্যময় বৈচিত্র্যে ভরা তেমন আর কোন বাঙালী লেখকের জীবন আছে ব'লে আমার জানা নেই। তাঁর জীবনের অনেক কাহিনীই আজও আমাদের অপরিজ্ঞাত: তবু যেটুকু আমরা জান্তে পেরেছি তাতেই তাঁর জীবনকে একটা সম্পূর্ণ উপন্যাস বলা চলে। অথচ বাঙালীদের স্মৃতি এমনই ক্ষণ-ভংগুর যে যে-শরৎচন্দ্রকে নিয়ে আমরা এই সেদিন মাতামাতি ক'রেছি, তাঁর মৃত্যুর মাত্র তিন বৎসর পরে আজ তাঁকে আমরা ভুলতে ব'সেছি। আজও শরৎচন্দ্রের পূর্ণাংগ প্রামাণ্য একখানি জীবনী প্রকাশিত হ'ল না। সাহিত্যিক খ্যাতি-লাভের পূর্বে শরৎচন্দ্র কেরাণীরূপে ব্রহ্মদেশে বহুকাল কাটিয়েছিলেন: সেই ব্রহ্ম প্রবাসের কতগুলি কাহিনী বর্তমান পুস্তকে লিপিবদ্ধ হ'য়েছে। লিখেছেন শরৎচন্দ্রের প্রীতিভাজন বন্ধু যোগেন্দ্রনাথ সরকার। লেখক একই অফিসে শরৎচন্দ্রের সংগে কাজ করতেন। শরৎচন্দ্রের প্রবাস-জীবনের বহু ঘটনাই যে তিনি জানতেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় বর্তমান গ্রন্থে। সংগীতানুরাগী শরৎচন্দ্র, চিত্র শিল্পানুরাগী শরৎচন্দ্র, সাহিত্যসাধক শরৎচন্দ্র প্রভৃতি আটটি অধ্যায়ে বর্তমান পুস্তকখানি বিভক্ত। শরৎচন্দ্র জীবিত থাকতে লেখাগুলো শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত অধুনা-লুপ্ত 'বাঁশরী' পত্রিকায় প্রকাশিত হ'য়েছিল। শরৎচন্দ্র লেখাগুলো প'ড়েছিলেন এবং বর্ণিত ঘটনাগুলির সত্যতা সম্বন্ধেও নিঃসন্দেহ ছিলেন। লেখাগুলো একত্রিত ক'রে পুস্তকাকারে প্রকাশ ক'রে নরেন্দ্র বাবু দেশের লোকের ধন্যবাদ ভাজন হ'য়েছেন। শরৎ-চন্দ্রের চরিত্রের অনেক গুলি অপ্রকাশিত দিকের ইংগিত আছে বইটিতে। আপাতদৃষ্টিতে শরৎচন্দ্রের জীবন খামখেয়ালী মনে হ'লেও, তাঁর জীবনে যে একটা যোগসূত্র ছিল এবং তাঁর প্রতিভার বিকাশের জন্যে তিনি যে নীরব সাধনা করতেন, তাঁর কিছুটা ইতিহাস পাওয়া যায় বর্তমান বইখানিতে। লেখক নরেন্দ্রনাথ সরকার সাহিত্যিক ছিলেন না: তাই তাঁর রচনায় উচ্চাংগের সাহিত্যরস না থাকলেও বইটি সুখপাঠ্য হ'য়েছে। ভবিষ্যতে শরৎচন্দ্রের পূর্ণাংগ জীবনী যদি কেউ লেখেন তবে তিনি এ বইখানি থেকে অনেক মালমশলা পাবেন। বইখানির ছাপা ও বাঁধাই ভাল।

গোপাল ভৌমিক

চিত্র

পরিচয়

একটী সঙ্গীত-শিক্ষালয়ের ছাত্রী একদিন এই শিক্ষালয়ের অধ্যক্ষের কাছে একজন যুবককে এনে তাঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। ছাত্রীটির নাম সতী (কানন মৈত্র), যুবকটি গায়ক অনন্ত রায় (সায়গল)। এই পরিচয়ের সুফলরূপে যুবকটি সঙ্গীত-বিদ্যালয়ের শিক্ষকরূপে ভর্তি হ'লো। এই শিক্ষকমহাশয়ের সুর লালিত্যের ছোঁয়াচে তাঁর ছাত্রী সতী দেবী সুগায়িকা হ'য়ে উঠলেন। একদিন কোনো বার্ষিক উৎসব হেতু সতী দেবী তাঁর কলাকুশলতার পরিচয় দিতে পেরে সকলের কাছেই অশেষ প্রশংসা পেলেন। তাঁর প্রশংসা লাভে শিক্ষকের বুক ফুলে ওঠাই উচিত ছিলো (অর্থাৎ যা হওয়া উচিত), কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এখানকার শিক্ষকটির বুক ফুলে উঠ্‌লো না : আরো সংকুচিত হ'য়ে এলো ঈর্ষায়। কেননা, শিক্ষক ভাবলেন—তাঁর ছাত্রীর প্রশংসা লাভের মূলে আছেন তিনি, তাঁর ঐকান্তিক চেষ্টা। তিনি না হ'লে তাঁর ছাত্রীর কণ্ঠে এই বীণানিন্দিত সুর লহরী ফুটতো কি করে? কি ক'রে পেতো এই প্রশংসা ও স্তুতিবাদ? কিন্তু তিনিই, যার সহায়তায় এই সাফল্য সম্ভব হ'লো, তিনিই প'ড়ে রইলেন নেপথ্যে, পর্দার আড়ালে? সূত্রপাত হ'লো এখানে। মনের দুঃখে শিক্ষক চললেন বনে, এক্ষেত্রে স্বগ্রামে (গ্রাম বনময়)। তাঁর সেখানে থাকা কালীন এদিকে সহরের এক বিখ্যাত ধনী আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় (রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়) সতীদেবীর পাণিপীড়ন করলেন। আশুতোষ নাম করা লোক, বিস্তর অর্থ, তা ছাড়া একটি দৈনিক পত্রিকার মালিক।

বিবাহের পরেও সতীর মনের মধ্যে কোথায় যেন একটু ফাঁকা ফাঁকা ঠেকতে লাগলো। কোনো জিনিষেই সে যেন প্রফুল্ল নয়, সর্বদাই উন্মনা। তার স্বামীর চোখে এ ব্যাপারটি পড়ায় তিনি সতীর মনে খুসি আনার জন্যে নানারকমের রকমারী জিনিষ এনে তার মন ভুলাতে চাইলেন। কিন্তু যার মন ইতিপূর্বেই কারণান্তরে ভুলেছে, নতুন ক'রে তার মন ভুলানো কষ্ট। অবশেষে সতী তার মনের কথা প্রকাশ করলো। সে যে একজনের কাছে ঋণী—তার অদ্যকার এই সৌভাগ্যময় জীবন লাভের মূলে যে একজন দুর্ভাগার দান আছে, সতী সকৃতজ্ঞ ভাবে তা তার স্বামীর কাছে প্রকাশ করলো। এবার আশুতোষ বাবু তাঁর পত্রিকার মারফৎ ডেকে ডেকে অনন্ত রায়ের সাড়া পেলেন। অনন্ত দেশ থেকে ফিরে এলে তার ছাত্রীর কাছে আত্মনিবেদন করে কোনো সাড়া পেলোনা। এদিকে আশুতোষবাবু তাঁর স্ত্রীর সুখের জন্যে অনন্তকে স-ভার্যা যথাসর্বস্ব দান ক'রে দিতে চাইলেন। অনন্ত গ্রহণ করতে রাজি হলোনা। এই ইটারন্যাল ট্রাঙ্গলের তিনটি কোন অতএব দুঃখের দিন যাপন করতে আরম্ভ করলো। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু সতী ভালবাসে তার স্বামীকেই, যদিও নিজের কৃতজ্ঞতা সে মজুত রেখেছে অনন্ত রায়ের জন্যে। কিন্তু অনন্ত আশুতোষ বাবুকে জানাতো যে, সতী ভালোবাসে অনন্তকেই। এ-ক্ষেত্রে স্বামীর মনের অবস্থা কি রকম হবার কথা—একবার ভেবে দেখুন! কিন্তু এত কপটতা একদিন খোলসা হ'য়ে গেলো, যেদিন মটোর চাপা প'ড়ে আসন্ন মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে অনন্ত অকপটে প্রকাশ ক'রে গেলো-যে, সতী তার স্বামীকেই ভালোবাসে॥···

গল্পাংশ নেহাৎ জ'লো, কোনোরূপ চিন্তা বা চেষ্টা না ক'রে কোনো রকমে খাড়া করা। যাঁরা

সত্যিকারের লেখক, চিন্তা করা যাঁদের পেশা ও যাঁদের স্বভাব—গল্প রচনায় যাঁদের মাথা পরিষ্কার, এমন লোক বাংলা দেশে হয়ত নেই। তা না হ'লে যে কোনো ভদ্রলোকের লেখা গল্প এভাবে চিত্রান্তরিত হয় কি ক'রে? আলোচ্য চিত্রের পরিচালক নীতীন বসু ইতিপূর্বে গল্পাংশ নিয়ে ঠকেছেন, ইতিপূর্বে তিনি অনেক দেশী বিদেশী বই দেখেছেন—তা সত্বেও তিনি গল্প বাছাই করা শেখেন নি। যদিও তিনি ক্যামেরা পরিচালনা ও চিত্রপরিচালনার ভার একই হাতে রেখেছেন ব'লে ছবিটা কিছু উৎরেছে। এই ধরণের গল্প নিয়ে অন্য কোনো পরিচালক যদি (অবশ্য দেবকী বসু বা প্রমথেশ বড়ুয়া ব্যতীত) চিত্রগ্রহণের চেষ্টা করতেন তাহ'লে ইণ্টারভ্যালেই হল খালি হয়ে যেতো। নীতীন বসুর কৃতিত্ব এইখানেই। তিনি অতি সাধারণ বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র ক'রে একটা চমৎকার ছবি তৈরী ক'রেছেন। পরিচয় দেখবার মত বই; অবশ্য অনেকে একে দেবদাসের সঙ্গে তুলনা ক'রেছেন– সেটা কিন্তু বাড়াবাড়ি, নির্বোধ প্রপাগাণ্ডা। আমরা নির্বিকার আলোচনা হিসেবে ব'লতে পারি—এ-ছবি নীতীন বসুর উপযুক্ত এবং প্রথম শ্রেণীর চিত্র।

চিত্রের সাফল্যের জন্যে দায়ী রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়। রতীন বাবু ইতিপূর্বে বিস্তর বইতে নেবেছেন—সেখানেই আমরা তাঁর শক্তির পরিচয় পেয়েছি কিন্তু শক্তির পূর্ণ বিকাশের সুযোগ তিনি এর আগে পাননি। কিন্তু এখানে তিনি সে সুযোগ পেয়েছেন। সেই জন্যেই তাঁর চরিত্রটি ফুটেছে সুন্দর ভাবে। নিউ থিয়েটার্সে তিনি এই প্রথম যোগদান ক'রেছেন—প্রথম শ্রেণীর অধিনেতারা যদি প্রথম শ্রেণীর চিত্র প্রতিষ্ঠান ও চিত্র পরিচালকের সহায়তা না পান—তাহ'লে তাঁদের যে দুর্দশা হয়, রতীনবাবু এতদিন সেই দুর্দশাগ্রস্ত ছিলেন। কানন মৈত্র তারপর। কুমারী কাননের অভিনয়ে আমরা কতবার কতভাবে মুগ্ধ হ'য়েছি, তার ইয়ত্তা নেই। কানন সিন্‌সিয়ার অভিনেত্রী, তার কণ্ঠস্বরে সংলাপে সঙ্গীতাংশে তার সিনসিয়ারিটির পরিচয় পাওয়া গেছে। বিশেষ ক'রে আলোচ্য চিত্রে বিবাহিতা কানন তার গত জীবনের শক্তিকে যেন দ্বিগুণিত ক'রে তুলেছে। পরিচয় চিত্রটি কেবল কানন ও রতীনের অভিনয়াংশ দেখার জন্যেই দেখা দরকার। বাংলা চিত্রে সায়গলকে স্থান দেওয়ার আমরা ঘোর বিরোধী : কিন্তু নীতীনবাবু এঁকে যে কী চক্ষে দেখে ফেলেছেন! ব্যক্তিগত পছন্দ অপছন্দে বাহির বিশ্বে ডেকে আনা উচিত হয়ত নয়! পরিচয় চিত্রটি সায়গল দ্বারা কলংকিত হ'য়েছে।

চিত্রগ্রহণের কথা উল্লেখ প্রয়োজন বোধ করিনা। কেননা, ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ ক্যামেরাম্যান নীতীন বসু চিত্রে ক্যামেরার ভার নিয়েছিলেন। আগাগোড়া ছবিটা তাই পালিশকরা ঝকঝকে। মন এতে অনেকটা আকৃষ্ট হবার কথা। শব্দগ্রহণ করেছেন বিখ্যাত শব্দযন্ত্রী মুকুল বসু। কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির সহযোগিতায় পরিচয় বিশিষ্ট চিত্রের পর্যায়ে উঠে এসেছে।

দর্শক

নাটমঞ্চ

নাট্যনিকেতনে ভারতবর্ষ

নাট্য নিকেতনে বাঙ্গলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার শ্রীযুক্ত শচীন্দ্র নাথ সেনগুপ্তের নূতন নাটক

'ভারতবর্ষ' মঞ্চস্থ হইয়াছিল, দর্শক সাধারণ নাটকটি গ্রহণ না করায় উহার অভিনয় বন্ধ হইয়া গিয়াছে। নাটকটি সম্পর্কে সমালোচক মহলে বিতর্কের সৃষ্টি হইয়াছে। প্রথমেই বলিয়া রাখা ভাল, এত তাড়াতাড়ি অভিনয় বন্ধ করিয়া দিবার মত নাটকখানি হয় নাই। সংস্কৃতি সম্পন্ন ও চিন্তাশীল দর্শকগণ নাটকখানি দেখিয়া খানিক আনন্দ পাইতে পারিতেন। নাটকের মধ্যে শিক্ষা দীক্ষা, সংস্কৃতি, অভিজ্ঞতা ও শুচিতার ঔজ্জ্বল্য ঝকমক করে এবং নিঃসন্দেহে এই নাটকটিকে সাহিত্যের পর্য্যায়ে স্থান দেওয়া যায়। নাটকটিতে যদি রসোত্তীর্ণ কাহিনী থাকিত, দৃশ্যাবলীর যোগাযোগ ছন্দোবদ্ধ বন্ধনে বাঁধা থাকিত এবং চরম পরিণতি পর্য্যন্ত মানবের অভিজাত অন্তরকে টানিয়া লইয়া যাইবার মত ঘটনাবলীর উপর জোর দেওয়া হইত তবে নাটকখানি নাট্যজগতে ও নাট্যসাহিত্যে যুগান্তর আনিতে পারিত। প্রথম শ্রেণীর নাটকের যে সকল গুণাবলীর প্রয়োজন তাহার সমস্তই কম-বেশী পরিমাণ ছিল কিন্তু উহা মূল কাহিনীর দুর্বলতার জন্য এবং যুদ্ধ প্রচেষ্টার প্রচারের জন্য (যুদ্ধ প্রচার কার্য্য করা নাট্যকারের উদ্দেশ্য নয় কিন্তু নাটকটির গতি এমনভাবে গিয়াছে যাহাতে উহাকে যুদ্ধ প্রচারকার্য্য বলিলে যুক্তিহীন মন্তব্য হয় না এবং দর্শকদের মনও প্রথম হইতে বীতশ্রদ্ধ হইয়া উঠে কারণ প্রচার কার্য্যে রসহানি ঘটিয়াছে) ব্যর্থ হইয়াছে। প্রধান চরিত্র ভারতচন্দ্রের ভূমিকায় যদি নাট্যাচার্য্য শিশিরকুমার কিংবা অহীন্দ্র চৌধুরী অবতীর্ণ হইতেন তবে নাটকটির এমন দুর্দশা হইত না বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। নাটকটি যুদ্ধ প্রচারমূলক কিনা তৎসম্পর্কে বিতর্কের সৃষ্টি হইয়াছে। আমরা প্রথম রাত্রির অভিনয় দেখিয়া নাটক-খানিকে প্রচার-মূলক নাটক বলিয়া ধারণা করিয়াছিলাম। দ্বিতীয় সপ্তাহে পুনরায় উহার অভিনয় দেখিয়াছি। দ্বিতীয় সপ্তাহে উহার বহুল পরিমাণ সংস্কার করা হইয়াছে এবং বহু প্রচারমূলক সংলাপ বর্জন করা হইয়াছে। সূক্ষ্ম বিচার বুদ্ধি দিয়া বিচার করিলে দেখা যায় নাটকটি সত্য সত্যই যুদ্ধ প্রচারমূলক নয়। তবে নাট্যকার unbalanced হইয়া পড়ায় প্রচারমূলক হইয়া পড়িয়াছে। নাট্যকারের উদ্দেশ্য গণতন্ত্রকেই সমর্থন করা। উদাহরণ স্বরূপ বহু কথা উদ্ধৃত করা চলে। আমাদের সকল কথা মনে নাই, একটি ছত্র মনে আছে যথা—নায়ক সুবোধ বলিতেছে—"আমি জানি একের আধিপত্য চিরস্থায়ী হবে না। আমি বিশ্বাস করি গণদেবতা গর্জে উঠে এক নায়কত্বের দর্প স্ফীত অসুরিক শক্তিকে ধূলোয় মিশিয়ে দেবেন, আমি আশা রাখি বিপুল এই পৃথ্বী সাম্যের প্রভাবে আবার শান্তির সন্ধান পাবে। এই বিশ্বাস, এই আশা নিয়ে স্বদেশের জন্যও যেমন তেমন বিদেশের জন্য যুদ্ধে যোগদান আমি কর্ত্তব্য বলে মনে করেচি।" যে যুদ্ধকে ভারতবাসী গণতান্ত্রিক যুদ্ধ বলিয়া স্বীকার করে না এবং উহার সমর্থনে সামান্যতমও যুক্তি নাই সে যুদ্ধে যোগদানের প্ররোচনাকে দর্শকগণ প্রীতির চোখে না দেখিলে দর্শকদের দোষ দেওয়া যায় না। বর্ত্তমান যুদ্ধে বৃটিশের নীতি সম্পর্কে বহু আলোচনা হইয়াছে কাজেই এবিষয়ে আমরা কোন আলোচনা করিতে চাই না। এই সম্পর্কে আর একটি সংলাপ উদ্ধৃত করিয়া আমরা ইহার আলোচনা সমাপ্ত করিব। তৃতীয় অঙ্কে বিজলী বলিতেছে 'বহুমূল্য এই নেকলেস ছড়া যুদ্ধে সর্বহারা নারী ও শিশুদের সাহায্য ভাণ্ডারে দান করে তার (মিঃ ব্যানার্জ্জীর) মহত্বের—তার উদারতার পরিচয় দিয়েচেন।' ইহার পর মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। অভিনয় মোটের উপর ভালই হইয়াছে। শুনিতে পাইলাম নাটকখানি পুনরায় অভিনীত হইবে।

নাট্যভারতী

নাট্যভারতীতে পি-ডব্লিউ-ডি এখনও চলিতেছে। অহীন্দ্র চৌধুরী এই নাটকের রায় বাহাদুরের ভূমিকা গ্রহণ করিতেছেন। যদিও নাটকখানি সংস্কৃতি বর্জিত ও সাধারণ স্তরের কিন্তু entertainable এবং প্রায় প্রত্যেকটি চরিত্র সুঅভিনীত হইয়াছে। তরুণ নাট্যকার শ্রীযুত অয়স্কান্ত বক্সীর নূতন নাটক 'রিহার্সেল'এর মহলা চলিতেছে, শীঘ্রই বুধ এবং বৃহস্পতিবারের জন্য মঞ্চস্থ হইবে।

ষ্টারে কমলে কামিনী

শ্রীযুত মহেন্দ্র গুপ্ত এম-এ প্রণীত নূতন নাটক কমলে কামিনী এখানে বিপুল সমারোহে অভিনীত হইতেছে। নাট্যকার স্বয়ং ইহার পরিচালনা করিয়াছেন। নাটকটি দেখিবার সুযোগ এখনও আমাদের হইয়া উঠে নাই।

মিনার্ভায় জয়ন্তী

শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় রচিত নূতন নাটক জয়ন্তীর অভিনয় আমরা দেখিয়া আসিয়াছি। অভিনয় দেখিয়া আমরা বিশেষ প্রীত হইতে পারি নাই। এ শ্রেণীর নাটমঞ্চে যে ধরণের নাটক সাধারণত অভিনীত হয় জয়ন্তী সে ধরণের নাটক নয়। প্রাচীনযুগের ঘটনাকে কল্পনা করিয়া আধুনিক ধারায় নাটকখানি বিরচিত হইয়াছে। ইহার বর্ণ বিভেদ করা কঠিন। চীপ থিয়েটারে ইহার নূতনত্ব ও বিশেষত্বের মূল্য আছে। নাটকের গল্পাংশ সুন্দর কিন্তু প্রকাশ আকর্ষণীয় নয়! মাঝে মাঝে নাটকীয় সংঘাত ঘটনা বৈচিত্র্য ও সংলাপের মধ্য দিয়া ঝঙ্কার দিয়া উঠে সত্য, কিন্তু নাটক রচনার দুর্বলতা ও নিকৃষ্ট শ্রেণীর অভিনয়ে তাহা স্থায়ী হইতে পারে না। শিবকালী চট্টোপাধ্যায়ের ও অর্পণাদাসের অভিনয় চমৎকার হইয়াছে। শেঠজীর ভূমিকা অভিনেতা (নাম জানা নাই) উমা মুখার্জ্জী নীরদাসুন্দরীর অভিনয় ভালই হইয়াছে। কুমারের ভূমিকায় যিনি অভিনয় করিয়াছেন তিনি অচল। অন্যান্য ভূমিকা চলনসই।

রঙমহল

রঙমহলের গেটে ঝাঁপি পড়িয়াছিল। শীঘ্রই রঙমহলের দ্বার খুলিবে! শ্রীযুত শিশির কুমার মল্লিকের প্রযোজনায় কুমার ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের 'উপন্যাস অচল প্রেমের নাট্যরূপ দ্বারা সম্ভবত রঙমহলের শুভ উদ্বোধন হইবে! শ্রীযুক্ত যোগেশ চন্দ্র চৌধুরী উপন্যাসটির নাট্যরূপ দিবেন।

মানসকুমার

সম্পাদকীয়

রবীন্দ্রনাথের আশীবৎসর বয়স পূর্ণ হবার উপলক্ষে নানা জায়গায় আনন্দোৎসবের আয়োজন হ'য়েছে। সাহিত্যিক এবং সাহিত রসিক মিলিত হ'য়ে রবীন্দ্রনাথের গুণাবলীর ব্যাখ্যা করার যথাসাধ্য চেষ্টা ক'রেছেন। কিন্তু তাঁর মত বিরাট প্রতিভার শক্তি-পরীক্ষার উপযোগী পরীক্ষক আছেন কি না আমাদের জানা নেই। আমরা সকলেই তাঁর অসীম শক্তিকে সীমা দিয়ে ঘেরাও ক'রে সামান্য আলোচনা করতে পারি মাত্র। এ আলোচনাকে ব্যাখ্যা বা পরীক্ষা নাম দেওয়া যায় না। তাঁর শক্তির পরিধি এতই বিপুল যে আমরা দুই হাতের বেড়ে সে শক্তিকে ধরতে পারিনে। রবীন্দ্রনাথ জগতের বিস্ময় ছাড়া আর কিছুই নন্। তাঁর শক্তির কথা ভাবলে অবাক্ হ'তে হয়। যে-দিকে তিনি লেখনী চালনা ক'রেছেন, তাঁর প্রতিভার স্পর্শে সেই দিকই সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠেছে। এমন মহামনীষীর আবির্ভাব আমাদের দেশে হওয়ায় আমরা কি পরিমাণ সৌভাগ্যবান, তা প্রকাশ ক'রে বলা সহজ নয়। 'জগৎ-কবির সভায় মোরা তোমার করি গর্ব। বাঙালী আজ গানের রাজা, বাঙালী নহে খর্ব॥' সত্যেন্দ্রনাথের কথায় আমাদের মনের কথা প্রকাশ ক'রে এই প্রার্থনা করি— রবীন্দ্রনাথ যেন আমাদের মধ্যে আরো অধিক দিন বর্তমান থাকেন।

● ●

খাঁটি গব্যঘৃত নাম দিয়ে সহরে বিস্তর সাপের চর্বি বিক্রী হ'চ্ছে। বিক্রেতারা নাম-করা ঘৃত-ব্যবসায়ী। চর্বির মধ্যেও সাপের দন্তগত বিষ সংক্রামিত হয় কি না সঠিক জানিনে। তবে, সাপের চর্বিতে দুগ্ধবতী গাভীর সশরীর প্রবেশ-পথ নেই —এটা অনুমান করি। আমরা সাম্প্রতিক সভ্য-সহরে বাস ক'রে খাঁটি ঘী-এর স্বাদ ও উপকারিতার কথা প্রায় ভুলে গেছি। স্বাস্থ্যের লোভে ঘৃতের ওপর যে স্বাভাবিক আকর্ষণ এসে যায়, তা প্রতিরোধ করার জন্যে বিশুদ্ধ শারীরিক শক্তি প্রয়োগ করতে হ'চ্ছে। কিন্তু ঘৃতাভাবে শারীরিক শক্তির মাত্রাও নিতান্ত পর্যাপ্ত নয়। এই দুর্বিপাকে মাঝে-মাঝে সাপের চর্বিই চর্বন করি। চর্বিত-চর্বণ নামক এক রকমের প্রক্রিয়ার কথা শুনেছি: আধুনিক বঙ্গকাব্যসাহিত্যে এই প্রক্রিয়ার মাত্রাধিক্য দেখা দিয়েছে। নূতন ধরণের এক প্রকার বিশুদ্ধ ও স্বাদে মনোরম এবং বিন্দুতে বিন্দুতে স্বাস্থ্যবীজপূর্ণ কবিতা টিন ভর্তি করার বদলে টিন পিটে চতুর্দিকে

প্রচারিত হ'চ্ছে। এ কবিতা শুদ্ধ সাপের চর্বি কিংবা বিশুদ্ধ বনস্পতি-নির্যাস তা অবশ্য প্রকাশ ক'রে বলা হ'চ্ছে না। তবে, আমাদের ধারণা, বহু গবেষণার ফলে যে-মূল্যবান জিনিষ আবিষ্কৃত হ'য়েছে—তা ঘৃত নামে প্রচারিত হ'লেও অবশ্যই খাঁটি গব্যঘৃত নয়। ঘৃতের চেহারা দেখেই তার খাঁটিত্ব সম্বন্ধে খাঁটি ধারণা হওয়া সম্ভব নয়। তার স্বাদ ও গন্ধ, ক্রিয়া ও উপকারিতা যাচাই ক'রে তার সম্বন্ধে অভিমত দেওয়া সম্ভব।

● ●

গত কয়েক বছর আগে এ-দেশে একই সঙ্গে জনকয়েক অডেন ইলিয়ট ও পাউণ্ড জন্মগ্রহণ ক'রে বঙ্গদেশ আলোকিত ক'রে তুলেছেন। এই কয়েকটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের অভাব বাঙলা বহুদিন থেকে বোধ করছিলো। কিন্তু এ-দেশে ভূমিষ্ঠ হ'লেও তাঁদের মুখে এ-দেশী কথা শোনা যায় না। যে-জিনিষ তাঁরা গলাধঃকরণ ক'রেছেন, তা জীর্ণ না হওয়ার দরুণ তাঁরা অজীর্ণ রোগাক্রান্ত। উপযুক্ত চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে এঁদের আটক রাখা দরকার। চিকিৎসকের পরিবর্তে কর্ণধার হওয়াই অবশ্য বাঞ্ছনীয়। কারণ, এ-রোগ থেকে নিষ্কৃতি পেতে হ'লে উপযুক্ত ভাবে কান তৈরি হওয়া দরকার। অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা বলেন, কবিতা রচনার মূলে শিক্ষিত কর্ণের প্রয়োজন। কান ঠিক না হ'লে কবিতার ছন্দ ও সুর ঠিক রাখা দুরূহ। এঁদের কর্ণ ঠিক করার জন্যে উপযুক্ত কড়া হস্তক্ষেপ প্রয়োজন।

● ●

সান্ধ্য অবসরে কবিতার বই পড়ার বাতিক অনেকেরই আছে। কিন্তু তাঁরা আজ-কাল কি ধরণের কবিতার বই পড়েন, আমরা তা জানতে পারলে উপকৃত হবো। আমাদের দেশে এখন যাঁরা কবিতা লিখছেন তাঁদের সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলার ইচ্ছে হ'চ্ছে। খোলসা ক'রে বলতে ভয় পাচ্ছি বন্ধুবিচ্ছেদ ও শত্রুবৃদ্ধির ভয়ে। তবে, পাঠকবর্গ নিশ্চয় জানেন-যে বর্তমান কবিতা-রচয়িতারা কবি নয়—তারা কাব্য-ব্যবসায়ী। যাঁরা আধুনিক-কবিতা পড়েন, অর্থাৎ যাঁরা ভুক্তভোগী, তাঁরা আমার মত্ নিশ্চয় অস্বীকার করবেন না। ব্যক্তিগত ভাবে কয়েকজনের আধুনিক-কবির সঙ্গে পরিচয় থাকায় মনের পরিধি অনেকটা সংকীর্ণ হ'য়ে এসেছে। কেউ কেউ অন্যের রচনা হুবহু নকল, কেউ কেউ অন্যের রচনা বেমালুম গাপ্ ক'রে কবি-খ্যাতি লাভ করার জন্যে উন্মত্ত হ'য়েছেন। সমস্যা এই, কি পড়া যায়? উপন্যাস বছরে কয়েকখানা বা'র হয়: তার মধ্যে বেশীর ভাগই—অর্থাৎ শতকরা ৯৮.৯—অপাঠ্য (কেউ কেউ বলেন—অখাদ্য)। প্রবন্ধ বাঙলা ভাষায় লেখা হয় না। যেটুকু হয়, তা পণ্ডিচারীতে ও শনিরঞ্জন ছাপাখানায়। দুই-ই অপাঠ্য। পণ্ডিচারীর প্রবন্ধকাররা দেন নির্জলা

উপদেশ, শনিরঞ্জনের লেখকরা দেন নির্লজ্জ গালাগাল। নাটকের কথা উল্লেখ ক'রে নিজেই যেন নিজের কাতুকুতুতে হাসছি। সেকালের কথা ছেড়ে দিন্। একালে লেখা নাটক কই?

● ●

অনেকে বলতে পারেন, এতগুলো নাট্যালয় তা'হলে কি অভিনয় করছে? তাঁদের কথার প্রথম জবাবই এই-যে প্রথমেই আমাদের দেখতে হবে—আমাদের নাট্যালয়ে সত্যিকার অভিনয় হ'চ্ছে কি না। মুখে রং মেখে পাদপ্রদীপের সাম্নে দাঁড়িয়ে কতকগুলি কথা বলার নাম অভিনয় নয়। আমাদের অভিনেতারা ঠিক অভিনেতা নন্। বঙ্গ নাট্যালয়ের অধঃপতনে অশ্রুবর্ষণ করার লোকের অভাব অবশ্য নেই। কিন্তু, যাঁরা সক্ষম তাঁরা যদি সজাগ দৃষ্টি দিতেন তা'হলে এই পতন আদপেই ঘট্‌তো কিনা সন্দেহ। বাঙলায় নাটকের যে অভাব, তার জন্যে দায়ী বাঙলার নট ও নটীরা। নটীরা নিজস্ব রঙ্গালয়ের নটীপনায় যেমন পটু—তার এক চতুর্থাংশ পটুত্ব যদি নাট্যালয়ের নটীত্বে দেখাতে পারতেন, তা'হলে নাট্যালয়ের এতটা ক্ষতি হ'তো না। আমাদের নাটকের যে এখন অভাব, তার মূলে আছে নট-নটীদের দায়িত্ববোধ-হীনতা। তাঁরা মঞ্চে দাঁড়িয়ে নাটকীয় চরিত্র ফোটাবার দিকে তত মনস্থ নন্—যতটা নিজের ব্যক্তিগত চরিত্রের ইস্তাহার জারী করায়। আত্মবিজ্ঞাপন নিয়ে এঁরা অবতীর্ণ হন্। এ-রূপ বিস্তর উদাহরণ তুলে দেওয়া যেতে পারতো, যদি আমরা সময়ের কাঙাল না হ'তাম।

● ●

কেউ কেউ বলেন, বাঙলায় মঞ্চ ভেঙেছে ছায়াচিত্রের অত্যাচারে। এ-কথা কখনই সত্য নয়। ছায়াচিত্র finished product, দর্শকের নিন্দা বা স্তুতিতে চিত্রের অভিনেতা অভিনেত্রীর অভিনয়-ধারা কখনই বদল হয় না, দর্শকের চিত্ত জয় করার তেমন সুযোগ ছায়াচিত্রে নেই। কিন্তু মঞ্চাভিনেতাদের কথা আলাদা। তাঁদের প্রত্যেককে মনস্তত্ত্ববিদ্ হ'তে হবে। অভিনয় আরম্ভ করার আগে পর্যন্ত তাঁরা জানবেন না, কি ধরনের অভিনয় তাঁরা আজ করবেন। মঞ্চে নেমে দর্শকদের হাবভাব ও মনের অবস্থা সমষ্টিগতভাবে বুঝে নিয়ে তাঁরা তাঁদের অভিনয়ের ধারা এনে নেবেন। দর্শকের মন জয় করাই অভিনেতা-জীবনের একমাত্র সাফল্য। কিন্তু তা'তো কখনই এ-দেশে হ'লো না। দর্শকের মন ব'লে একটা ব্যাপার-যে আছে, এ-কথাই আমাদেব অভিনেতারা জানেন না। তাঁরা ছায়াবাজির মত একঘেয়ে অভিনয় দিয়ে মঞ্চ মাৎ করার মতলব নিয়ে অভিনয় আরম্ভ করেন। এতে দর্শকদের ধৈর্যচ্যুতি হওয়াই স্বাভাবিক। ধৈর্যচ্যুতির পরিণতি—বিরক্তি। মঞ্চের দর্শক-সংখ্যা দিন দিন ক'মে যাচ্ছে হয়ত এই কারণেই। মঞ্চের অভিনেতা যদি মঞ্চেই লেগে থাকেন, ছায়াছবিতে না যান, অথবা ছায়াশিল্পী মঞ্চে না

আসেন তাহ'লেও অনেকটা সুফলের আশা করা যায়। কিন্তু এ-ক্ষেত্রেও বঙ্গ-কাব্য সাহিত্যের মত কর্ণধারের অভাব। এখানেও খাঁটি গব্যঘৃত নাম দিয়ে মঞ্চে বা পর্দায় একই মেকী জিনিষ চালানো হ'চ্ছে।

● ●

দর্শকের কথা বলছিলাম। আমাদের অভিনেতারা দর্শকের কথা ভাবেন না। কিসে দর্শকের মনস্তুষ্টি হবে এ চিন্তাই তাঁদের নেই। কিন্তু মঞ্চাভিনয়ের একটি অপরিহার্য অঙ্গই দর্শক। যত রকমের শিল্প আছে, চিত্র ভাস্কর্য স্থাপত্য—এদের কোনোটায় যদি দর্শক না থাকে, তাতে শিল্পীর ততটা ক্ষতির কারণ হয় না, যতটা হয় মঞ্চাভিনয়ে। এটা খুব সত্যি কথা-যে কোনো শিল্পীর কাজ যদি নগদ মোটা দামে বিক্রী হ'য়ে যায়, তাহ'লে মনে মনে তিনি হৃষ্ট হন। কিন্তু বিক্রী হবার পূর্বাহ্নে যখন তিনি সৃষ্টিকার্যে লিপ্ত থাকেন তখন সম্মুখে কোনো নিপুণ সমঝদারকে বসিয়ে তারিফ পেতে চান না। এমন কি, সাহিত্য বিষয়েও এই একই কথা খাটে। কিন্তু আমাদের আলোচ্য অভিনয় ব্যাপারে সম্মুখে কিঞ্চিৎ জনতার প্রয়োজন সর্বদাই থাকে। অথচ সেই জনতার মনের চাহিদার বিষয়ে যদি সম্পূর্ণ উদাসীন হ'য়ে ভীম-ভূমিকায় গদা-যুদ্ধ আরম্ভ করি, তাহ'লে শুধুই কি পালোয়ানী কায়দা দিয়ে মন জয় করতে পারবো? আমাদের অভিনেতারা দয়া ক'রে একথা ভেবে দেখুন! আমাদের সুকুমার কলাই বলুন অথবা চারুশিল্পই বলুন—যাদের কথা লাইন কয়েক উপরে উল্লেখ ক'রে এলাম—তারা নিজেরা একা একাই সম্পূর্ণ—কোনদিন তার যদি তারিফ না-ও হয়, কিংবা চূড়ান্ত তারিফ হয়, তাহ'লেও তার যে-রূপ ছিলো সেই রূপই থাকবে। মঞ্চাভিনয় স্ব-সম্পূর্ণ নয় তাকে নির্ভর করতে হবে সাধারণের উপর। এ-কাজে যদি আমাদের অভিনেতারা সজাগ হন, তাহ'লে হয়ত নাট্যালয়ের প্রদীপে আবার শিখা সঞ্চার হবে—নচেৎ নয়।

● ●

কিন্তু যে-কথায় এত কথা উঠে পড়লো: আমাদের নাটক। অভিনয় নিয়ে অনেকক্ষণ বক্তৃতা করলাম বটে, কিন্তু কি অভিনয় হবে—তাও তো ভাববার বিষয়। আমাদের এদিকে তেমন মুখরোচক নাটকই-বা কোথায়। হাল্কা ও অপূর্ণ—যার মধ্যে নাটকীয় পরিস্থিতি নেই এমন কয়েকটি নাটকের গন্ধ অবশ্য পথে ঘাটে পাওয়া যায়। পড়ার বা অভিনয় করার মতো নাটকের বড় অভাব। নাটককে দু'ভাগে ভাগ করা চলে: এক, আগুনের পাশে ব'সে পড়ার; দুই, নাট্যালয়ে অভিনয় দেখার। আগুনের পাশে ব'সে পড়া কথাটি অবশ্য বিদেশী হ'য়ে গেলো। বিদেশী হবার কারণ—দু'জন বিদেশীর কথা ব'লে বক্তব্য প্রকাশ করার

ইচ্ছে। বার্নার্ড্-শ-র নাটক অভিনয়-উপযোগী ততটা নয়, সেই জন্যই তা'কে ব্যর্থ নাটক বলা চলে না; তার দ্বিতীয় মূল্য আছে -পাঠ করা। কিন্তু ইউজীন ও'নীলের নাটক প'ড়ে ততটা আনন্দ নেই, যতটা দেখে আনন্দ পাওয়া যাবে বলে অনুমান করি। এইভাবে নাটককে দু'ভাগে ভাগ করা চলে বটে, অথচ এই দ্বিবিধ নাটকের অভাব-হেতু আমরা নাটক না পাই পড়তে, না পাই দেখতে! আমাদের এই প্রদেশটিতে হঠাৎ হু হু ক'রে একপাল কবি জন্ম-গ্রহণ ক'রে নিলেন। তাঁরা যদি নিজেদের মধ্যে আপোষে বাছাই হ'য়ে একভাগ নাটক নিয়ে উঠে-প'ড়ে লাগেন (যেমন কবিতাকে মানুষ করার জন্যে উঠে-প'ড়ে লেগেছেন)—তাহ'লে হয়ত কারো কারো কাছ থেকে বছর কয়েক বাদে (অর্থাৎ অনুশীলন ও চেষ্টার পর) কয়েকটি নাটক পেতে পারি। বাঙালা দেশে নাট্যকারের দেখা নেই, আগে থেকেই পূর্বোক্ত কবির পালের মত কতকগুলি নট এসে পৌঁছে গেছেন! রাস্তায় ঘাটে ট্রামে বাসে লক্ষ্য করলেই বাবড়ি চুল ঢুলুঢুলু চোখ বক্রভুরু কবিত্বপূর্ণ-হাসি ইত্যাদি দেখা যায়। (এ-যেন ভ্রমণ-কারীর ছদ্মবেশে ইরানে বা বুলগেরিয়ায় দলে দলে জার্মান-সেনার অতর্কিত শুভাগমন!)!

কয়েকটি অভিমত

আনন্দবাজার পত্রিকা—৪ঠা জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৮, ১৮ই মে ১৯৪১।

বর্তমান সংখ্যা (বৈশাখ) নাচঘর পড়িয়া প্রীত হইলাম। রচনা, আঙ্গিক সৌষ্ঠব এবং ছাপার কাগজ সকল দিক হইতে সুন্দর ও আকর্ষণীয়। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র, অশোকনাথ শাস্ত্রী, প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়, সাগরময় ঘোষ, সুশীল রায় প্রভৃতির লেখা প্রবন্ধগুলি উল্লেখযোগ্য। পরেশনাথ সান্যাল, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, কমলাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ও রবীন্দ্র মজুমদারের কয়েকটি সরস কবিতা আছে। তারাপদ রাহা ও কমলাক্ষ দাসগুপ্তর গল্প দু'টি সুলিখিত। ইহা ছাড়া সিনেমা, রঙ্গজগৎ, শিল্পকলা প্রভৃতি বিভাগীয় বিষয়গুলি সুলিখিত। আমরা পত্রিকাখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

পাঠাগার—১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৮।

দুটি কথা শ্রীশ্রীদোললীলা কলা-বৈচিত্রের প্রভাব ও আমার জীবন (শেখভের অনুবাদ) ইহা ব্যতীত সম্পাদক সুশীল রায়ের "ইজিচেয়ার" নামক প্রবন্ধটির মধ্যে যথেষ্ট নূতনত্বের ছাপ বর্তমান। আমরা প্রবন্ধ সাহিত্য বলিতে হয় উপদেশ বর্ষণ কিংবা দল গত propaganda বুঝি। এই পথ দুইটী পরিহার করিয়াও যে প্রবন্ধ সাহিত্য হয় সুশীল রায়ের রচনাটি তাহারই প্রমাণ।

যুগান্তর

বৈশাখ সংখ্যা 'নাচঘর' আমরা পাইয়াছি। এই সংখ্যায় অনেকগুলি উৎকৃষ্ট রচনা স্থান পাইয়াছে—তন্মধ্যে সুরেন্দ্র নাথ মৈত্র, অশোকনাথ শাস্ত্রী, প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়, সুশীল রায় প্রভৃতির প্রবন্ধ, তারাপদ রাহা, কমলাক্ষ দাশ গুপ্ত প্রভৃতির গল্প এবং কিরণ শঙ্কর সেনগুপ্ত, পরেশ নাথ সান্যাল, রবীন্দ্র মজুমদার প্রভৃতির কবিতা উল্লেখযোগ্য। এতদ্ভিন্ন একখানি মূল এবং একখানি অনুবাদ উপন্যাস ধারাবাহিকভাবে বাহির হইতেছে। অনুবাদ উপন্যাসটি রুশীয় সাহিত্যিক চেকভের মাই লাইফের অনুবাদ এবং অনুবাদ করিতেছেন গোপাল ভৌমিক। পুস্তক পরিচয় সিনেমাও রঙ্গমঞ্চ সমালোচনা কলাবিভাগ ইত্যাদি অংশগুলি সুলিখিত এবং সুরুচি-সম্মত। আমরা এই উৎকৃষ্ট মাসিক পত্রিকাটির ক্রমোন্নতি কামনা করি।

পরিচয়, বৈশাখ, ১৩৪৮

'নাচঘর' কিছুদিন 'যবনিকাগ্রস্ত' ছিলো (সম্পাদকীয় বিবৃতি থেকে উদ্ধার করছি), সম্প্রতি সম্পাদক মহাশয় মঞ্চ থেকে নমস্কার জানিয়েছেন। ফলে ত্রয়োদশ বর্ষের প্রথম সংখ্যার অর্থাৎ ১৩৪৭ সালের মাঘ মাসের 'নাচঘর' আমাদের হস্তগত হ'য়েছে। যদিও এই পত্রিকাটির নাম সাহিত্যিক মর্যাদার পরিচায়ক না, তবু একাধিক ভালো সাহিত্যিক রচনা এই সংখ্যায় প্রকাশিত। এই গুলির মধ্যে নাচ-সম্বন্ধে প্রবন্ধ তিন —বোধ হয় নামকরণের সার্থকতা প্রমাণের জন্যে।

AMRITABAZAR PATRIKA, 18th May, 1941

We have received the Vaisakh issue of the monthly "Natch-Ghar" for review and we are glad to say that the journal has given us entire satisfaction by virtue of its valuable contents, excellent printing and admirable get-up.

The present issue contains interesting articles by Sjs. Surendranath Maitra, Asoke Nath Sastri, Sushil Roy, Promode Kumar Chatterji and Sagarmoy Ghosh. Stories by Sjs. Tarapada Raha, Kamalaksha Das Gupta and poems by Sjs. Kiron Sankar Sen Gupta, Paresh Nath Sanyal and Rabindra Majumdar also deserve special mention. The serial novel by Sj. Saroj Majumdar is being regularly published. A very important feature of the present issue is that it contains the first instalment of Tchekhov's famous novel "My Life," which is being ably rendered into Bengali by Sj. Gopal Bhowmik.

নাচঘর

সুশীল রায়, সম্পাদক

গোপাল ভৌমিক, সহঃ-সম্পাদক

ধীরেন ঘোষ, পরিচালক

ত্রয়োদশ বর্ষ } আষাঢ়, ১৩৪৮ { চতুর্থ সংখ্যা

নিয়মাবলী

১। মাঘ মাস থেকে নাচঘরের বর্ষারম্ভ;

২। প্রত্যেক মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে নাচঘর প্রকাশিত হয়;

৩। প্রতি সংখ্যার নগদ দাম চার আনা, বার্ষিক সডাক তিন টাকা চার আনা;

৪। শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত, নৃত্য, সমাজ, ধর্ম ইত্যাদি সম্বন্ধে সুচিন্তিত ও সুলিখিত প্রবন্ধ এবং মৌলিক ও অনুবাদ গল্প উপন্যাস একাঙ্ক-নাটক কবিতা প্রভৃতি রচনা নাচঘরে সাগ্রহে গৃহীত হয়;

৫। উপযুক্ত ডাকটিকিট দেওয়া না থাকলে অমনোনীত রচনা ফেরৎ দেওয়া সম্ভব নয়;

৬। রচনাদি সম্পাদকের নামে প্রেরিতব্য।

কার্যালয়:
৮, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা
টেলিফোন: কলিকাতা ৩১৪৫
টেলিগ্রাম: রিদম্‌স্‌ (Rhythms)

সূচীপত্র

লেখ্য-সূচী

চিত্র-সূচী

অদৃষ্ট না পুরুষার্থ

প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়

সোণার বাঙ্গলার একজন ভূতপূর্ব্ব কৃতী শিল্পী। অধুনা অকৃতী হলেও আজ এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতার কথা বলবার আগে যেটুকু না বললে নয় সেইটুকু মাত্র বলচি। লক্ষ্মী হয়েছিলেন আমার প্রতি বিরূপ, এক সময়ে এতটা অনুগ্রহ দেখিয়ে তারপর এই উপেক্ষা, এর দৃষ্টান্ত বিরল না হলেও এর মধ্যে যে বৈচিত্র আছে তা ভুক্তভোগী ব্যতীত অন্যের বুঝবার সাধ্য নেই। কোথা থেকে ক্রমে ক্রমে এই ছয়টি বৎসরের মধ্যে, কোথায় এসে ঠেকেছি,—যখন ভেবে দেখি অবাক হয়ে যাই।

এই ক' বছরের মধ্যে প্রথম চারটি বছর এক ভদ্র বিলাত প্রত্যাগত আই. সি. এস. পরিবারে একটি শিক্ষকের কাজ, পঁচিশ টাকা মাইনা ছিল স্থির, একমাত্র অবলম্বন; পরে গত বৎসর থেকে ঐ পরিবারেরই অপর একটি মেয়ে, এই দুই ছাত্রীর চিত্র এবং গান শিক্ষার ভার আর দ্বিগুণ সময়ের পরিবর্ত্তে মাইনা পঞ্চাশ টাকায় দাঁড়িয়েছে। কষ্টে সৃষ্টে আমার সংসার খরচের অর্দ্ধেকটা এইখানেই নিশ্চিত হ'ল অপর অর্দ্ধেকটার জন্য নানা কর্ম্মের ধান্ধায় থাকতে হয়। এর মধ্যে আরও এক সত্য এই যে, আমার কর্ম্ম আর কর্ম্ম পদ্ধতি, তাঁরা একটু সুনজরেই দেখেছিলেন; আর সেই জন্য তাঁরা এই কয় বছরে একে একে আট নয় খানা পোট্রেটও করিয়েছিলেন আমার হাত দিয়ে, আর তার জন্য যে পারিশ্রমিক দিয়েছিলেন তাতেও আমার কম উপকার হয়নি। তা'ছাড়া তাঁরা তাঁদের সহানুভূতির পরিচয় নানা ভাবেই দিয়েছিলেন,—বিপদে আপদে অথবা বড় টানাটানির সময়ে মাহিনা থেকে কতকাংশ অগ্রিম দেওয়ার ব্যাপার, এতো প্রায়ই ছিল,—এর উপর আবার কন্যাদায়ে, আমার অসহায়-অবস্থার খবর পাবামাত্রই তাঁরা অম্লান বদনে পাঁচশত টাকা বিনা সর্ত্তে অগ্রিম দিয়ে যে উপকার করেছিলেন, সে কৃতজ্ঞতা আমার আজও মর্ম্মের অনুভব হয়েই আছে, নানা ভাষায় মৌখিক ধন্য-বাদে তাকে খাটো করতেই চাইনি। তাঁদের অনুকম্পার আর একটা দৃষ্টান্ত না দিলে আমার শান্তি হবে না তাঁদের কথা লিখে, সেটা এই যে,—কন্যার বিবাহের সময় ঐ টাকা দেবার পর বোধ হয় এক দেড় মাসের মধ্যেই এক বড়ই কঠিন এবং গুরুতর দায়ে আবার একশো পঁচিশ টাকার প্রয়োজন,—তার জন্য রাত্রে আমার ঘুম নেই। নিরুপায় হয়ে অত্যন্ত সঙ্কোচের সঙ্গে

সব কথা আবার লিখলাম তাঁদের ;—ফেরৎ ডাকেই চেক্ এলো সেই সঙ্গে সে টাকা পরিশোধেরও ব্যবস্থা হল অপূর্ব্ব ;—প্রতি মাসে মাইনা থেকে দশটাকা হিসাবে তেরো মাসের মধ্যেই শোধ। এই ভাবে নানা দিকেই আমি তাঁদের কাছে উপকৃত ;—বিপন্ন অবস্থায় কখনও বিমুখ হইনি। এটিও সত্য যে, কঠিন আমার ঐ সকল অভাব, তাঁদের সাহায্যে মোচন, আমি ভগবৎ বিধান বলেই মনে করেই এসেছি—আর সে সকল পরিশোধের যে ব্যবস্থা তাও তারই বিধান ব্যতীত অন্য মনে করিনি। এই ভাবে তাঁদের মধ্যে দিয়েই আমি ভগবৎ কৃপাই অনুভব করেছিলাম। এই পর্য্যন্ত গেল আমার সংসার যাত্রার যে খরচটুকু না হলে নয় তার মোটামুটি অর্দ্ধাংশের পরিচয়। যখন কোন কোন মাসে কাজের অভাবে অপরার্দ্ধ যোগাড় না হয়ে উঠতো তখন ঋণগ্রস্থ হওয়া ছাড়া উপায় ছিলনা। এমনও ঘটেছে যে উপরি উপরি তিন মাস আর অন্য কোন কাজ জুটাতে পারিনি, তাতে বেশী হয়ে গেছে ঋণের ভার। এই ভাবে আমার দুঃখ যে সমান ভাবেই চলছিল একথা না বললেও চলে।

এখন, প্রতি বৎসরের শেষে ডিসেম্বরে একাডেমী অফ ফাইন আর্টসের উদ্যোগে, মিউজিয়ামের দোতালায় একটি করে শিল্পকলা প্রদর্শনী হয়ে থাকে একথা সকলেই জানে। প্রতি বছরেই আমি ছবি পাঠাই - কখনও ফেল করিনি। আমার মত আরও অনেক শিল্পীই পাঠিয়ে থাকে। অনেকের বিক্রিও হয় দেখতে পাই বছর বছর। অবশ্য ওখানে ছবি বিক্রির ব্যাপারে আসলে শিল্পকলার ক্ষেত্র থেকে উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট বলে কোন কথা নেই : দেখেছি চটকদার, চখে লাগসই হলেই ঠিক লেগে যাবে। সকলেই আশা করে যে, ছবি বিক্রি হোক, তবে যার ছবি একবার বিক্রি হয় দেখেছি তার আশাই বেশী হয়ে থাকে ;—তবে এটাও আবার দেখেছি তার ছবি চট করে আর বিক্রি হয় না। আমার ভাগ্য ছবি বিক্রি সম্বন্ধেও বিচিত্র, যেমন বিচিত্র আমার কর্ম্ম আর অবস্থার প্রভাবে ব্যবস্থা বুদ্ধি। তাই ভাবি, জগদম্বার কি চমৎকার মাপা যোকা নিখুৎ দান, একেবারে অবস্থার সঙ্গে ঠিক ঠিক মেলানো। ঠিক এক বৎসর অন্তর ঐ প্রদর্শনীতে একখানি করে ছবি আমার বিক্রি হয়ে আসচে সেই প্রথম প্রতিষ্ঠার বৎসর থেকে। এই ছয় সাত বছরে এর কোন ব্যতিক্রম দেখলাম না। গত বৎসর আমার একখানি বিক্রি হয়ে চুকেছে, সুতরাং এ বছরে আর হবার কথা নয়, তবুও প্রতিবারে ছবি পাঠাতে ত্রুটি করি না। তা ছাড়া আশাকে ত নিরস্ত করতে পারিনি, যদি লেগে যায় এবারেও। আশায় আশায় দিতাম এ বছরেও, আর নূতন ছবিও কয়েক-খানি ছিল আঁকা, কিন্তু গোল বাধলো, ঐ এন্ট্রি ফি, ফ্রেমিং, গাড়ি ভাড়া ইত্যাদি খরচটা কোন রকমেই জোগাড় করতে পারলাম না, কাজেই শেষ পর্য্যন্ত দেওয়াও হলনা। শেষে একটা

ব্যাপারে বুঝেছিলাম যে এবারে না দেওয়া ভালই হয়েছে। এবারে স্টেটস্‌ম্যানে সুরবদ্দি সাহেব নাকি ইণ্ডিয়ান আর্টকে তথা আর্টিস্টদেরও জাহান্নামে পাঠিয়েছেন। যাই হোক এবারে কিছুই দেওয়া হলনা সুতরাং আশারও কিছু নেই। এমনই অবস্থা হয়ে এসেছে একথা কাকেও বলবার নয়,—দরদী যারা তাদের অবস্থা আমারি মত, যার দরদ নেই তাদের কাছে বলা—তাদের আরও কঠিন করে তোলা, উপরন্তু তাদের ঘৃণা বাড়ানোই হবে। ভাবনায় বুক, মুখ সব শুকিয়ে উঠলো, ও'দিকে দেনার চাপ খুবই ভারি হয়ে উঠেছে, বাড়িতে ঢুকতে ভয় হয়।

এখন, কি উপায় করা যায়, ছবি ত কোন রকমে কিছু বিক্রি করতেই হবে, অন্য উপায় ত নাই। কারো কাছে থোক্ থাক্ পাবারও আশা নেই। ছবি বিক্রির চেষ্টা যত রকমে সম্ভব, বাইরে বাইরে অর্থাৎ প্রাইভেট পার্টির কাছে চেষ্টা করা গেল, শেষে শুনা গেল কুচবিহার মহারাণী ইন্দিরা এখন এখানেই আছেন। তাঁরই শরণাপন্ন হওয়া ব্যতীত আর কোন উপায়ের কথা মনে হোলো না। এক সময় তিনি আমার কাজ বড় ভাল বাসতেন। তিনি আমার সেই সময়ের (১৯২১—১৯২৬) উৎকৃষ্ট কাজের অনেকগুলিই কিনেছিলেন। বৰ্দ্ধমান, কুচবিহার, মাইশোর আর পাটিয়ালা—এই চারজন বড় পেট্রনের মধ্যে তিনিই আমার বেশী ছবি রেখেছেন। অনেক দিন পর গত বৎসর একবার আমার দুঃসময়ে খোঁজ করেছিলেন। তখন আমার সবে ব্লাড প্রেসার আরম্ভ হয়েছে। আমার অসুখের কথা শুনেই চারশত টাকা পাঠিয়েছিলেন ভাল করে চিকিৎসা করাবার জন্য।. এখনও তিনি এখানেই আছেন যখন, একবার ত চেষ্টা করিতেই হয়।

আমাদের শিল্পি-চক্রের পূর্ণিমা সম্মিলনে গিয়ে তাঁর সম্বন্ধে কত কথাই শুনলাম। তার মধ্যে সার কথা এই যে এই সিজন অর্থাৎ নভেম্বর, ডিসেম্বর, জানুয়ারীতে, আমাদের অনেক-গুলি সতীর্থ তাঁকে ছবি গছাবার চেষ্টায় হদ্দমুদ্দ করলেও শেষ অবধি কেউ কৃতকার্য্য হতে পারেননি। হায়রান হ'য়ে এখন তাঁরা নিরস্ত হয়েছেন কিনা এ খবরটা কিন্তু পেলাম না ;—শুনলাম কেবল মাত্র একজন বিলাত প্রত্যাগত পোর্ট্রেট স্পেশালিস্ট (আমাদের সতীর্থ জুনিয়ার) এক-খানি ছোট খাট সাইজের অর্ডার পেয়েছেন। তাঁর স্বর্গত স্বামীর আলেখ্য, তাঁর মেয়েকে জন্মদিনের উপহার দেবেন বলেই কাজটি তিনি করাচ্চেন। ব্যস,—এ বছরে শিল্পিদের সঙ্গে তাঁর এই পর্য্যন্তই সম্বন্ধ। সকলকার সাদর নিমন্ত্রণ (ছবি দেখবার) প্রত্যাখ্যান করে সকলকেই এ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত করেছেন। সভায় এই সব শুনেও আমার মত একজনের দমবার কোন কারণ আছে বলে মনে হোলো না। একবার হাত পা নাড়তেই হবে। দেখা যাক কি আছে এই বিচিত্র অদৃষ্টে। ভেবে চিন্তে ডিসেম্বরের মাঝা মাঝি একখানা পত্র পেশ করলাম একেবারেই মহারাণী ইন্দিরার কাছে। কয়েকখানা নূতন ছবি

যদি দেখতেন, অনেক দিন আমার কাজ হয়ত দেখেননি, আশা করি দেখলে সময় বৃথা নষ্ট হবে না। পত্রখানা উডল্যাণ্ডস্ আলিপুরের ঠিকানায় পাঠিয়ে খুব বেশীক্ষণ উদ্বেগ ভোগ করতে হোলো না, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর উপদেশ মত তাঁর হাউস্হোল্ড সেক্রেটারীর লিখিত পত্রে যা উত্তর পেলাম তার ভাবার্থ এই যে,—এখন তোমার ছবি দেখার সুবিধা হবেনা আমার, তবে আমার মেয়ে (জয়পুরের মহারাণী) এখানে আমার কাছেই আছেন, তিনি তোমার ছবি দেখতে চান। কাল দশটা থেকে এগারোটার মধ্যে সেগুলি নিয়ে এসো !

দয়াময়ী, নিজে কোন ছবিই নেবেন না এবছরে,—যদি তাঁর মেয়ের কিছু পছন্দ হয় তাই এই অনুগ্রহটুকু করেছেন। পরদিন যথাসময়ে হাজির হলাম কয়েক খানি ছবি নিয়ে। জয়পুর মহারাণী ছবিগুলি সবই দেখলেন, বেশ ভাল করেই দেখে, তরুলতা, বলে একখানির দাম কত জিজ্ঞাসা করলেন। শেষে বললেন, এখানি রেখে যান পরে জানাব এ সম্বন্ধে, বলে চলে গেলেন।

এই ঘটনার ৮ দিন পর শুনলাম তিনি জয়পুর চলে গেছেন। হয়ত সেখান থেকে লিখবেন এই ভেবে আরও এক সপ্তাহ অপেক্ষা করে, আমার এখন কি করা উচিত—পরামর্শ নিতে গেলাম, উডল্যাণ্ডসে। সেখানকার হাউসহোল্ড সেক্রেটারীকে সকল কথা জানিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম আমার ছবিখানা কি তিনি নিয়ে গেছেন সঙ্গে ? হাঁ, নিশ্চয়ই নিয়ে গেছেন। আপনি হোম সেক্রেটারীকেই লিখবেন কারণ এবারে তিনিই সঙ্গে ছিলেন তাঁর। মহারাণী যে ঐ ছবি নিয়ে গেছেন, তার এই দাম, মহারাণীর অনুমতি হলে দামটা পাঠিয়ে বাধিত করবেন।

তাইই করলাম, উপরন্তু মহারাণীকেও একখানি পত্র দিলাম, তাতে দামের কথা নয় কেবল ছবিখানির মূল ভাবটির কথাই বিশদ করে লিখলাম যা সে দিন বলা হয়নি। জানুয়ারী মাসটা পুরাই গেল, ফেব্রুয়ারীও গেল, মার্চ্চ মাসের প্রথমে আবার উডল্যাণ্ডসে হাউস-হোল্ডের কাছে উপস্থিত হলাম,—এখনও কোন পত্র পেলাম না জয়পুর থেকে, ব্যাপার কি, কি করা যায় এখন ? শুনে তিনি আকাশ থেকেই যেন পড়লেন,— আপনার ছবি ত এখানেই পড়ে আছে বরাবর, তিনি ত ছবি নিয়ে যান নি !

চমৎকার !!! সুবুদ্ধিটা আমায় এ দুঃসময়েও ত্যাগ করেনি,—সুতরাং কোনও প্রশ্ন উত্তর না করে, অতিশয় বিনীত ভাবে প্রার্থনা করলাম,—দয়া করে ছবিখানা তাহলে আমায় দিয়ে দিন, নিয়ে চলে যাই। শুনে তিনি বললেন, চলে যান আজকে আপনি,—মহারাণীকে জিজ্ঞাসা করে কাল পাঠানো হবে আপনার ছবি।

একপক্ষ 'কাল' পরে এপ্রেলের ৪ তারিখে গরম গরম ছবিখানা এক দরোয়ানের

হাতে এসে পৌঁছালো স্টুডিওতে দুপুর বেলায়। পিয়ন-বইতে একখানা পত্র, তাতে লেখা আছে, অতঃপর মহারাণীর আজ্ঞায় ছবি ফেরৎ পাঠানো গেল, প্রাপ্তি স্বীকার করবেন।

ছবিখানা স্রধু তপ্ত নয়, বাঁকা হয়ে তেবড়ে গিয়েছে, তাকে এখন হট্‌প্রেসে দিলাম। ধরাৎ আমার ঠিক সময়ে উপযুক্ত ফলই দিয়েছে—এইটাই ত এখনকার পক্ষে স্বাভাবিক অন্য রকম হলে অস্বাভাবিক হত। কারো কাছে কোন অভিযোগ করবার নাই। × × × × যখন মাস শেষে টিউসানীর দরুন মাইনা পেলাম তখন সকলকে হাতে পায়ে ধ'রে কিছু কিছু দিয়ে সে দিনকার বাজার খরচ পর্য্যন্ত রইলো না; বড় দেনার কথায় কাজ নাই, তাদের কাছে মুখ দেখাবার যো নেই।

আরও একমাস গেল,—কেমন করে যে কাটলো তা আমি ঠিক বলতে পারবনা কারণ শরীরে সর্ব্বক্ষণই যেন জ্বর হয়ে থাকতো। বড় বড় মেয়েরা বুদ্ধিমতী, আমার এই অবস্থা ক্রমাগত দেখতে দেখতে তারা পরস্পর ঝগড়া ঝাঁটি যেন বেশী বেশী আরম্ভ করেছে। আমি যখন এসে পড়ি,—অমনি সব চুপচাপ, যেন চিরশান্তি বিরাজ করচে বাড়িতে। তাদের মুখে মাঝে মাঝে কেমন একটা অস্বাভাবিক অবসাদ, অথচ আমার প্রতি শ্রদ্ধার যে অভাব তা নয়,—অসহায় দীর্ঘকাল কঠিন রোগে পীড়িত শিশুর উপর মায়ের যেমন হয়ে থাকে, প্রায় সেই রকম। বাহিরে কোনও অনুযোগ নাই অথচ তাদের মনোভাব নীরব অনুযোগে ভরা। সে অনুযোগ যে আমার উপর নয় তা স্পষ্টই বুঝা যায়;— সে অনুযোগনী অবস্থার উপর, সময় সময় যেন ভগবানের উপর। তাদের বাবা, এত ভাল লোক, কখনও কারো সঙ্গে অসদ্ব্যবহার করেনি, কাকেও বঞ্চনা করেনি, তার এত গুণ, এত সরল প্রাণ, কপটতার লেশ মাত্র নাই; তার কেন এমন অবস্থা? কখনও কখনও অনুযোগটা দেখি দেশের বড় লোকের উপর এসে পড়ে। তারা এতদিকে এত পয়সা উড়ায়,—আর তাদের বাবা এমন ভাল ভাল ছবি এঁকে রেখেচেন সে সব নিয়ে উপকার করতে পারে না? ভাবনায় ভাবনায় তাদের বাবার অমন চেহারা কালি হয়ে যাচ্ছে, অসুস্থ শরীর নিয়ে পরিশ্রম করে চলেছেন, কখনও এক মুহূর্ত্ত চুপ করে বসতে দেখা যায় না, হয় লেখা, না হয় পড়া, না হয় ছবি আঁকা, যতক্ষণ বাড়িতে থাকেন এক মুহূর্ত্তও সময় নষ্ট করতে তারা দেখেনি। এমন কি জ্বর অবস্থায়ও কাজ করে চলেছি. এ সব তারা চক্ষের সুমুখেই দেখচে,—তাই তাদের অবসাদের ছায়া মুখে ফুটে উঠে। তাদের কাছে এলে আমি কিছুতেই বিষণ্ন মুখ রাখতে পারি না। ছোটদের নানা রকমের ছড়া বলে আদর করতে আরম্ভ করে দি,—আমার একটু প্রফুল্ল ভাব দেখলে তারা মহা খুসী হয়ে উঠে,—আমার প্রবঞ্চনা তারা সরল প্রাণে ধরতে পারে না।

কি করা যায়—? কোনো পথ খোলা নেই, যেন আমার সকল রাস্তাই বন্ধ। উপায়

উদ্ভাবনা, মনের যে অবস্থায় সহজ হয় আমার যে সে অবস্থা নেই তা বলাই বাহুল্য। কয়েকটা লেখা নিয়ে আজ কাল মেতে থাকি যতক্ষণ বাড়িতে থাকি। দুপুর বেলা স্টুডিওতে যাই, সেখানে কখনও ছবি ফিনিস্ করি কখনও বা লেখাই চালিয়ে যাই যখন যেমন মনের ইচ্ছা বা প্রবৃত্তি থাকে। সময় সময় ছবি নূতন কিছু আঁকতেও ইচ্ছা করে না। কি হবে রাশী রাশী ওয়াটার কলারের ছবি এঁকে,—যা পোকা মাকড়, ডাম্প, ধূলা এসব থেকে বাঁচিয়ে রাখা শক্ত। আমাদের দেশের অদ্ভুত জল হওয়া। বর্ষার চারমাস ছবি গুলি একেবারে যেন ম্লান হয়ে যায়—জোলো হাওয়া লেগে লেগে উপরে যেন একটা সর পড়ে যায়। স্টুডিওতে থাকলে, ছবির দুর্গতি দেখতে দেখতে ভিতরটা অশান্ত হয়ে উঠে,—কেমন করে এগুলি রক্ষা পাবে ধ্বংসের হাত থেকে।

আর বাড়ী! সে ত যন্ত্রণাদায়ক। অশেষ কষ্টকর ব্যাপার দাঁড়িয়েচে আমার এই ভাবের সংসার করা। শিল্পী বলে আগে, প্রতিষ্ঠার সময় একটা গর্ব্ব, আত্মপ্রসাদ ছিল, তা একেবারেই চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেছে: ক্রমে ক্রমে এই কয় বছরে। এখন একটা ভয়ের ভাব জেগে উঠে মাঝে মাঝে মনের মাঝে, কেমন করে সংসারে এই নয়টি প্রাণীর অশন বসন, প্রসার প্রীতি,—জোগাবো আমি। যেন চরম অবস্থায় এসে পৌছেচি, স্বয়ং মৃত্যুর আবির্ভাব না হয় এ অবস্থার পরিবর্ত্তন,—মধ্যে আর কিছু নাই।

এখন সেই চরমের কথাটাই বলি আজ।

তিনটি মাস কোন কাজ হাতে এল না যখন, চারিদিকেই ঋণভার গুরু হয়ে উঠেছে,—পকেটে একটি পয়সা নেই ;—তা নাইই থাক, নয়টি প্রাণী আমার মুখ চেয়ে আছে। সকালেই খবর পাওয়া গেল আজ আবার চাল নেই! অবশ্য মেয়েরা বুদ্ধিমতী, বল্লে,—এ বেলার মত খোরাক জোগাড় আছে বাবা! ও বেলায় আনতে হবে, না হলে চলবে না।

মাঝে কয়েক ঘণ্টা মাত্র সময়। মুদির দোকানে মুখ দেখাবার জো নেই। তিনটি মাস তারা কিছুই পায় নি, একশত এগারো টাকার ফর্দ্দ দিয়েছে কিছু না পেলে আর মাল দেবে না ত বটেই, বলেছে আগামী মাসে নালিশ করবে। সকলের চেয়ে চমৎকার ব্যাপার আজ কয়েকদিন থেকে ব্লাডপ্রেশারটি বেড়েছে গত পরশু থেকে, তার উপর জ্বর, সে জ্বর এখনও ছাড়ে নি। এ জ্বরের কথাটা মেয়েরা জানতে পেরেছে কেমন করে জানি না। রোজ বেলা ২টা ২॥০টা থেকে জ্বরটা আসে, প্রবল নয়, সারা রাত ভোগ হয়ে ভোর বেলা ছেড়ে যায় তারপর এতটাই দুর্ব্বল হয়ে পড়ি যে হাতখানা যেন তুলতে কষ্ট হয়।

প্রাতঃকৃত্য শেষ করে এক কাপ চা খেলে পর একটু সুস্থ বোধ করি। কাল থেকে জ্বর আর ছাড়ে নি।

এখন চাল নেই, আর বাজারের কথা না বললেও চলে, কারণ আজ তিন দিন কাঁচা তরিতরকারী বাড়ীতে ঢোকেনি, মাছ মাংস ত দূরের কথা। ডালওয়ালা ডাল দিয়ে যায়, আর চালটা কেনা থাকলে ডাল ভাতেই চলে; শেষে আমাদের গিন্নির অনেক রকম তেলে ফেলা আচার জারেতে ভরা আছে, কাঁচা আম, কাচা লঙ্কা থেকে, এঁচড়, তেঁতুল জলপাই, ফুলকোপি, আমড়া, ওল আলু, এই রকমের সকল কিছুই আছে তার মধ্যে,—অভাবে স্বভাবে সেগুলি ভারি উপকারে লাগে: দুঃসময়ে যখন তরকারী জোটে না। যাহোক, এখন আসল কথা আমায় বেরোতেই হবে চা খেয়ে। স্ত্রী এসে প্রথমে আমার কপালে হাত দিয়ে দেখলেন, জ্বর যেই টের পেলেন, অমনি ধীরে ধীরে বললেন, এই অসুস্থ শরীর তার উপর খাওয়া নেই, কিছু জোরাল জিনিষ পেটে পড়ছে না, এমন অবস্থায় কেমন করে—ইত্যাদি, বাধা দিয়ে বললাম আসল কথাটা এখন বল না শুনি ওসব কথা এখন দরকার নেই। তখন একে একে তিনি যা বললেন, তার মর্ম্মার্থ হ'ল এই যে আজ চার পাঁচ মাস বড় বড় মেয়েদের কাপড় নেই, পোষাকী কাপড়গুলো পরে পরে ছিঁড়ে এনেচে—অন্ততঃ একজোড়া করে না হলে ত নয়; বলি বলি করে এতদিন বলিনি, আর এখন না বললেও নয়, এতদিনেও যখন তোমার চোখে পড়লো না। তাঁর নিজের কাপড়ের কথাটা আর বললেন না,—ছেঁড়া কাপড়কে সেলাই করে বাগিয়ে পরতে তাঁর জুড়ি নেই। আমার থান কাপড় সব একটু আধটু পচে এলেই সে গুলি নিয়ে পাড় বসিয়ে নিজের কাজ চালাচ্ছেন অনেক দিন থেকেই। আমায় কাপড় দাও—কখনও বলতে শুনিনি,—মনেই হয়না কতদিন কাপড় কিনে দিইনি তাঁকে।

এখন আর বেশীক্ষণ বাড়িতে থাকতে প্রাণ-চাইল না, বেরিয়ে পড়তে পারলে বাঁচি। জামাটি পরে জুতায় পা ঢোকাচ্ছি, ছোটটি (চতুর্থ) এসে উপস্থিত। তোমার আবার কি কথা?—মেজদি আর ছোড়দি, আর আমার তিন জনের তিন তিন মাসের মাইনে জমেছে দিদিমুনি বলেছেন—ইত্যাদি। থাক থাক আর বলতে হবে না, আমি আসি এখন।

সদরের গলিতে নামবার আগেই, ক্রীং ক্রীং ক্রীং—। এই যে নমস্কার এবারে ওয়ারেণ্ট বেরুবে, পাঁচ কোয়াটারের টেক্স বাকী মশাই, কতদিন আর রাখা যায়,—এই নোটিশটা সই করে নিন। পাঁচ কোয়াটার, কুড়ি টাকা চোদ্দ আনা করে এক কোয়াটার; সুতরাং—। আচ্ছা ভাই। চৌদ্দ দিনের সময়। দুর্গা শ্রী বলে, মনে মনে জগদম্বাকে স্মরণ করে উদ্দেশেই বললাম এই বার তোমার সঙ্গে আমার একটা চরম বুঝাপড়া করবার

সময় এসেছে, মা,—কেমন মা তুমি আমার, এইবার পরিচয় দিতেই হবে। মনে আছে, এমন অবস্থায় আন্তরিকই বলে ছিলাম।

কিন্তু হায়! অমন করে মাকে ডেকে ত ঘরে বসে থাকতে পারলাম না,—জ্বালায় ছট্ ফট্ করতে করতে পথে বেরিয়ে পড়লাম। কোথায় যাব? আত্মীয় স্বজন; বন্ধু-বান্ধব পরিচিত এমন এক জনের কথা মনে হোলনা যেখানে গিয়ে অন্ততঃ আশ্রয় নিতে পারি। ঘনিষ্ট পরিচয় যাদের সঙ্গে, তাদের কাছে আগে হাত পাতা হয়ে গেছে,—আর এখন যেতে প্রাণ চাইল না। তারপর ট্রামে উঠে না হয় ঠিক করে ফেলা যাবে কোথায় যাব, ট্রামে উঠে দেখি, পকেটে কোথায় পয়সা? নেমে, হাঁটতে আরম্ভ করলাম।

নাঃ, এমন অপদার্থ জীবনে কি সুখ? মাসের পর মাস, বছরের পর বছর এই ভাবে চলছে আমার সংসার জীবন, ঋণ করা, আর ঋণ শোধ করা কত কষ্ট, এমন অসহায় আমার মত আর কে আছে,—অদ্ভুত! সারা যৌবন কিসের পিছনে ঘুরে বেড়ালাম,—তা জানিনা, এখন প্রৌঢ়ে অর্থের অভাবে দুর্গতির সীমা নেই।

এই যে,—বাবু! আপনাকে আজ কত দিন খুঁজচি, ঠিকানা জানিনা, শুনেছিলাম স্টেশনের কাছে; আজ অদৃষ্ট ভালো দেখা হয়ে গেল। মাসিক কাগজের সম্পাদকের ছেলে। কি ব্যাপার? দেখুন, একটা কভার ডিজাইন করতে হবে; বাবা বললেন, আপনার মত কেউ করতে পারবে না; ওটা আপনাকেই করতে হবে। (খাতিরের কাজ, পয়সা দেবেন না, কারণ কাগজটা এখনও নিজের পায়ে দাঁড়ায় নি।) ছেলেকে প্রথমে পাঠিয়েছেন সে যদি সুবিধা করতে না পারে তখন নিজে আসবেন। আমি ভালই চিনি এদের। কোন রকমে এখন বিদায় করতে পেলে বাঁচি। বাবাজী কথা কইতে কইতে তিনকোণা ছোট ছেলেদের পার্কটার মধ্যে ঢুকে পড়লেন, আমাকেও একটু যেতে হল সঙ্গে। অনেক দুঃখে তাকে বিদায় করে ছায়া দেখে বসলাম একটা বেঞ্চিতে।

সুখ সচ্ছলতার মুখ দেখিনি আজ কয় বছর, ১৯৩৫ সাল থেকেই চলছে একটানা, ক্রমে ক্রমে মাথাটা যেন নেমেই যায়, সংসারের কথা মনে হলে মাথা তুলতে পারিনা। শেষে এই যে উপসর্গটি ব্লাড-প্রেশার এর লক্ষণ মাথা মুণ্ড যদি কিছু বুঝে থাকি। তবে এই টুকু বেশ টের পাই,—সারা শরীরে প্রাণের প্রবাহ যেন অস্থির হয়ে ছুটেচে, অতি দ্রুত চলেছে প্রাণের গতি আর সঙ্গে সঙ্গে হৃদপিণ্ডের স্পন্দন;—কিন্তু. ইন্দ্রিয়গণ যেন অবসন্ন;—হাঁ করে দাঁড়িয়ে প্রাণের গতির পানে চেয়ে রয়েচে। মাথার মধ্যে আগুন, জল পড়লেও ঠাণ্ডা হয় না। কেবল চিন্তার স্রোত হুহু চলেছে, সে চিন্তার মূল নাই, অবশেষ নাই, সুসংবদ্ধ কোনটাই নয়,—ব্যবচ্ছিন্ন, অথচ সকলগুলিই গুরুতর, কোনখানটা তার লঘু নয়। উপযুক্ত যোগাযোগ ঘটলে ভাল সাহিত্য হতে পারতো। অবশ্য এই দুঃসময়ের মধ্যে কিছু সাহিত্য চর্চ্চা যে হয় নি তা নয়,—সে গুলি সম্পাদক এবং সাধারণ পাঠকের সন্তোষের জন্য তাতে আমারও যৎসামান্য অর্থ ও সন্তোষ এসেছে স্বীকার করি, কিন্তু তার ততটা গুরুত্ব নাই।

এর পর শেষটুকু আগামীবারেই বলব।

নাট্যকার মধুসূদন

কণাদ গুপ্ত

একদা বঙ্কিমচন্দ্র নাকি এই অভিমত প্রকাশ করেছিলেন যে, নাট্যকার হিসাবে মধুসূদন তেমন সফল হতে পারেন নি। তারপর বহুযুগ গত হয়েছে। সাক্ষ্যপ্রমাণ নিয়ে এ মতের বিরুদ্ধে আজ আর মামলা করা চলে না। কারণ, মধুসূদনের নাটক ক্রমশঃ অপ্রচলিতই হয়ে আসছে। কালের প্রহরী এড়িয়ে কাব্যকার মধুসূদনের নাম মানুষের মনে অক্ষয় আসনের পাকা ব্যবস্থা করে নিয়েছে; কিন্তু অনেকদিন আগের তোলা ফটোগ্রাফের মত নাট্যকার মধুসূদনের চিত্র মানুষের মানস-পটে ক্রমশঃ ফিকা হয়ে আজ একেবারে মিলিয়ে যেতে বসেছে।

কিন্তু তবু সাহিত্যের দরবারে শুধু প্রচলন অপ্রচলন নিয়েই সাফল্য অসাফল্যের বিচার করা চলে না। এলিজাবেথীয় যুগের প্রথম নাট্যকারদের নাটক এক শতাব্দীর বেশী দর্শক-রুচিকে তুষ্ট করতে পারেনি; তাই বলে তাঁরা অসফল নন্। রুষ রঙ্গমঞ্চে গোগোলের নাটক আজ অচল; তাই বলে দুঃসাহসী সমালোচকও ইন্‌স্‌পেক্টরের লেখককে ব্যর্থ বলতে পারেন না। খুঁজলে পরে এঁদের মত নিদর্শন সব দেশের সাহিত্যেতি-হাসেই পাওয়া যায়।

যাঁরা গোড়া বাঁধেন, শেষ করার গৌরব প্রায়ই তাঁদের ভাগ্যে জোটে না। তাই বলে গোড়া বাঁধা বিফল হয় না। হিমাদ্রির উত্তুঙ্গ শিখর দেখে দেশ-বিদেশের দর্শক চমৎকৃত হয়ে ফিরে যায়। তারা শিখরই দেখে, 'বেস্' বা পাদদেশের খবর রাখে না। কিন্তু তাই বলে 'বেস্' অসফল নয়, শিখরকে পৃষ্ঠে বহন করাতেই 'বেসের' সাফল্য। বঙ্গনাট্যের ইতিহাসে মধুসূদনও এই 'বেস্'।

তর্কপ্রিয় পণ্ডিতেরা বাংলা নাটকের গোড়া খুঁজতে গিয়ে যত তর্কেরই অবতারণা করুন না কেন, আপনার আমার কাছে, যদু মধুর কাছে, এ কথা অনস্বীকার্য্য যে শ্রীমধুসূদনই বঙ্গনাট্যের আদি জনক। যাত্রা বা হাফ-আখড়াইকে বিনয় করে নাটক শ্রেণীতে ফেললেও ওরা ঠিক নাটক নয়, নাটকের পূর্ব্বপুরুষ। প্রাক্-মধুসূদন যুগে যে বিদ্যাসুন্দর অভিনয় হত,

আধুনিক সংজ্ঞা অনুযায়ী তাকেও ঠিক নাটক আখ্যা দেওয়া চলে না। রামনারায়ণ তর্করত্নের 'রত্নাবলী'ও মৌলিক নাটক নয়, হর্ষের সংস্কৃত নাটিকার বঙ্গানুবাদ।

আধুনিক বাংলা নাটকের জন্ম হোল সেদিন, যেদিন প্রাচীন সংস্কৃত নাট্যপ্রথার সঙ্গে পাশ্চাত্য নাট্যপ্রথার সঙ্গম ঘটলো। এ সঙ্গমের প্রথম পরিচয় পাই 'শর্ম্মিষ্ঠা'য়। বেলগাছিয়া নাট্যশালায় 'রত্নাবলী'র অভিনয় দেখে মধুসূদন বীতশ্রদ্ধ হয়ে বলেছিলেন, 'বাংলা ভাষায় ভাল নাটক নেই ? আচ্ছা, আমি লিখব।' এই সংকল্পেরই ফল 'শর্ম্মিষ্ঠা'। অবশ্য নিজে 'রত্নাবলী'র ইংরাজী অনুবাদ করেছিলেন বলে, মধুসূদন সিংহলরাজদুহিতার প্রভাব বহুদিন এড়াতে পারেন নি। 'শর্ম্মিষ্ঠা'তেও সেইহেতু তার ছাপ রয়েছে যথেষ্ট। সংস্কৃত নাটকের মত উপমাভারাকুল সংলাপের জড়ত্ব থেকে 'শর্ম্মিষ্ঠা'ও মুক্ত নয়। কথায় কথায় পৃষ্ঠাব্যাপী স্বগতোক্তি করার ব্যামো সংস্কৃত নাটকের মত 'শর্ম্মিষ্ঠা'রও প্রায় সকল চরিত্রের আছে। নাটকের গতিতে জীবন নেই, যেন দম দেওয়া। সত্য। কিন্তু নান্দি সূত্রধরের বালাইও এতে নেই। আর, শর্ম্মিষ্ঠা চরিত্রে সংস্কৃত নায়িকার লাজ-সুন্দর নমনীয়তার সঙ্গে গ্রীক নায়িকার সগৌরব গাম্ভীর্য্যের এমন একটা সহজ সংমিশ্রণ ঘটেছে যে, শুধু সেই থেকেই বলা যায়, শর্ম্মিষ্ঠা মধুসূদনের নাট্য-বিপ্লবের নেত্রী না হন, অন্ততঃ সংবাদবাহিনী দূতী।

মধুসূদনের নাট্যবিপ্লব শুধু ভারী নাটকের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল না। এমন কি, প্রহসনের ক্ষেত্রেও বিস্তৃতি নিয়েছিল। অভিনয়োপযোগী প্রহসন পূর্ব্বে ছিল না বললেও চলে। 'বুড়ো শালীকের ঘাড়ে রোঁয়া' এবং 'একেই কি বলে সভ্যতা' এ অভাব ঘোচায়। গঠন-পদ্ধতির দিক থেকে 'শর্ম্মিষ্ঠা' ছিল অচল, কিন্তু প্রহসন দুটি একেবারে নিখুঁত। প্লট দুটি এগিয়ে গেছে এমন স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে যে, মনে হয় যেন কোন বাস্তব ঘটনা থেকে নেওয়া। অতিরিক্ত প্রাচ্যধর্ম্মী এবং অতিরিক্ত পাশ্চাত্যধর্ম্মী হওয়ার দোষ দেখান হয়েছে প্রহসন দুটাতে। ওই বিষয় নিয়ে পরবর্ত্তী যুগে দীনবন্ধু, গিরিশ ঘোষ, দ্বিজেন্দ্রলাল প্রভৃতি অনেক নাট্যকারই প্রহসন লিখে গেছেন। বাঁধুনি অথবা বৈচিত্রের দিক থেকে তাঁদের দু'একটি হয়ত মধুসূদনের প্রহসন দুটাকে ছাড়িয়ে গেছে ; কিন্তু পরম বৈষ্ণব ভক্ত প্রসাদ বা অতি সভ্য নবকুমারবাবুর প্রতিদ্বন্দ্বী চরিত্র খাড়া করতে আজও পর্য্যন্ত কোন প্রহসনকার সক্ষম হয়েছেন বলে মনে হয় না। যোগীন্দ্রনাথ বাবু প্রহসনদ্বয়ের সমালোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন, এ-দুটীর 'প্রধান দোষ এই যে, তাহাদিগের অনেক স্থান অশ্লীলতা দোষে দূষিত।' কিন্তু সে দোষ ঠিক প্রহসন দুটীর নয়। সে দোষ সেই 'কালের' না হলে, যারা আজকের যুগের লোক, সেই আমাদের চোখে মধুসূদন, দীনবন্ধু এবং গিরিশ ঘোষের মধ্যে অশ্লীলতা দোষে কে যে অধিকতম দুষ্ট, এ নির্ণয় করা সত্যই দুরূহ।

কিন্তু প্রহসন লিখে ফুরিয়ে যাবার জন্য মধু-প্রতিভার সৃষ্টি হয় নি। তিনি হাত দিলেন

'পদ্মাবতী'তে। 'পদ্মাবতী'র মশলা যুগিয়েছে গ্রীক পুরাণ। কিন্তু কাঠামোর দিক থেকে এও সংস্কৃত নাটকের মত। তা ছাড়া, নাটক রচনার চেয়ে নাট্যকারের বেশী নজর ছিল ছন্দের দিকে। অমিত্র ছন্দের প্রবর্ত্তন হয় 'পদ্মাবতী' নাটকে। নূতন এক্সপেরিমেণ্ট বলে এ নাটকের অমিত্রছন্দ তেমন সুখপাঠ্য হয় নি। 'পদ্মাবতী'র চরিত্রগুলিও 'শর্ম্মিষ্ঠা'র মত তেমন স্পষ্ট হয়নি, অনেক জায়গায় ঝাপ্‌সা থেকে গেছে। এই সব কারণে অভিনয়োপযোগী নাটক হিসাবে 'পদ্মাবতী'র বিশেষ কোন মূল্য নাই।

'শর্ম্মিষ্ঠা' এবং 'পদ্মাবতী' নাটকের প্রধান ত্রুটী, এদের মধ্যে নাটকোপযোগী অ্যাকসনের (action) অভাব। অ্যাকসন্ আসে বিরোধ থেকে—নায়কের মনের আভ্যন্তরীণ বিরোধ এবং অপরাপর চরিত্রের সঙ্গে সংঘাতের ফলে বিরোধ। এই বিরোধই নাটকের লয়কে করে তোলে দ্রুত এবং নাটককে করে প্রাণবান। মধুসূদন প্রাচীন প্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলেও সংস্কৃত নাটকের প্রভাব একেবারে বর্জ্জন করতে পারেন নি। তাই এই দুটী নাটকে বিরোধের চেয়ে তপোবন সুলভ শান্তির ভাবই বেশী। তাই নাটক দুটী হয়েছে ঢিমা লয়ের। কাব্যভাগ হয়ে পড়েছে বেশী, নাটকের ভাগ গেছে কমে।

এই সব ত্রুটী থেকে শিক্ষা লাভ করে পরবর্ত্তী নাটকে মধুসূদন সজাগ হয়ে গেলেন। ঐতিহাসিক নাটক লিখবার জন্য 'রিজিয়া'য় হাত দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর পৃষ্ঠপোষকদের পছন্দ হোলো না, দর্শকেরা মুসলমান-প্রধান নাটক পছন্দ করবেন না, এই ভেবে। কিন্তু 'রিজিয়া' নাটকের যে সংক্ষিপ্ত আদর্শ বা সিনপ্‌সিস্ তিনি তৈরী করেছিলেন, তাতে বেশ বোঝা যায় যে, পূর্ব্বের দোষ ত্রুটী এড়িয়ে 'রিজিয়া' একখানি নিখুঁত বিষাদান্ত নাটক হয়ে উঠত। অ্যাকসনে এবং প্লটের জটীলতায় 'রিজিয়া' আধুনিক নাটকের সঙ্গে তুলনীয় হতে পারত। অলিখিত নাটকখানির জন্য আরও দুঃখ হয় এই কারণে যে নারী-চরিত্র হিসাবে রিজিয়া, শর্ম্মিষ্ঠা এবং পদ্মাবতী থেকে সম্পূর্ণ একটা বিভিন্ন টাইপের সৃষ্টি করত।

'রিজিয়া'য় যা হতে গিয়ে হোল না, তা সম্ভব হোল 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকে। এই নাটকেই মধুসূদনের নাট্য-বিপ্লব লাভ করল পূর্ণ পরিণতি। প্রাচীন প্রথানুযায়ী নাটক বিষাদান্ত হবার বিধি নেই। 'কৃষ্ণকুমারী' বিষাদান্ত, এই ঘটনাটাই বিপ্লবের একটা দিক। তারপর নাটকের যা বিষয়—রাজ্যরক্ষার জন্য রাজপুত-রাজকন্যার অপূর্ব্ব আত্মত্যাগ এবং রাজার তা'তে সম্মতিপ্রদান—শৃঙ্গার রসের পরিবর্ত্তে করুণ রসের এই প্রাধান্য, এও অভিনব। নাটকীয় কৌশলেও 'কৃষ্ণকুমারী' পূর্ব্বের নাটক দুটি অপেক্ষা অনেক বেশী সমৃদ্ধ। তৃতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে কৃষ্ণকুমারী স্বপ্ন দেখল, পদ্মিণী দেবীরূপে আবির্ভূতা হয়ে বলছেন, দেখ্ বাছা, যে যুবতী এ বিপুল কুলের মান আপন প্রাণ দিয়া রাখে সুরপুরে তার আদরের সীমা থাকে

না। কৃষ্ণার মনে এ স্বপ্ন লেগে রইল। এমনি ভাবে কৃষ্ণকুমারীর আত্মত্যাগকে সম্ভাব্য করে তোলা, নাটকীয় পরিণতিকে সম্ভাব্য করে নেওয়ার কৌশল মধুসূদনের পূর্ব্বের নাটকে পাওয়া যায় না। চরিত্রাঙ্কনের দিক থেকেও 'কৃষ্ণকুমারী'র ধনদাস বেশ স্পষ্ট। ধনদাস ভণ্ড দুষ্মণ-চরিত্রের একটি চিরকেলে মডেল। ঐ শ্রেণীর চরিত্র অঙ্কনে পরবর্ত্তী নাট্যকারেরা বিশেষ কিছু উন্নতি করেছেন বলে মনে হয় না। তপস্বিনীকে গিরিশ ঘোষের অনেক নাটকে খুঁজে পাওয়া যায়। আর, কৃষ্ণকুমারীর চরিত্র ঐতিহাসিক নাটকের ত্যাগী নায়িকার আদর্শ হবার যোগ্য। বাস্তবিক, ভাষাকে যুগোপযোগী করে নিলে 'কৃষ্ণকুমারী' সকল যুগেই অভিনেয়।

'কৃষ্ণকুমারী'র পর আসে 'মায়াকানন'। কিন্তু 'মায়াকাননে'র মাত্র কতকাংশ মধুসূদনের, তাও মুমূর্ষুর লেখনী দিয়ে লেখা। বস্তুতঃ, মধুসূদনের নাটক-সংখ্যা নিতান্তই অল্প। তাঁর নাটকীয় প্রতিভা যে সময় পরিপূর্ণরূপে বিকাশ পাচ্ছিলো, ঠিক সেই সময়েই তিনি কাব্যরচনার দিকে মনোযোগ দেন। মধুসূদন অমিত্রছন্দের প্রবর্ত্তক। ওই ছন্দে 'মেঘনাদ বধ' লিখে তিনি চিরস্মরণীয়। কিন্তু কাব্য হলেও কাহিনী, দৃশ্য, সংলাপ এবং চরিত্রাঙ্কনের দিক থেকে 'মেঘনাদ বধ' ছদ্মবেশী নাটক। নাটক রচনায় শিক্ষানবিশী করে তিনি যে জ্ঞান ও প্রতিভাস্ফুরণ অর্জ্জন করলেন, তার সমস্ত ফল লাভ করল 'মেঘনাদ বধ'। এ কথা ঠিক যে, 'শর্ম্মিষ্ঠা' এবং 'পদ্মাবতী' নাটকের নাটকত্ব খুঁজতে গেলে মাইক্রোস্‌কপের প্রয়োজন হয়; কিন্তু 'শর্ম্মিষ্ঠা' এবং 'পদ্মাবতী' লিখেছিলেন বলেই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, নাটকীয় চরিত্র হিসাবে রামের চেয়ে রাবণই হবে যোগ্যতর। তাঁর ভিতরের নাট্যকারই তাঁকে জানিয়ে দিয়েছিল যে, রাবণ-চরিত্রের dramatic possibilities রামের চেয়ে অনেক বেশী।

মধুসূদনের আগের নাটকগুলো যে কাঁচা হয়েছিল, তার কারণ শুধু তাঁর তখনকার কাঁচা হাত নয়, তার কারণ তিনি রচনাপদ্ধতির দিক থেকে কিছুতেই 'রত্নাবলী'র ভুল শিক্ষা ভুলতে পারছিলেন না। পরবর্ত্তী নাট্যকারেরা—গিরিশ ঘোষ প্রভৃতি—পদ্ধতির জন্য অনুসরণ করেছিলেন সেক্সপীয়রের এবং বিষয় ও চরিত্রের জন্য অনুসরণ করেছিলেন প্রাচীন আদর্শকে। সেইহেতু তাঁরা খানিকটা শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছিলেন। 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক স্বতন্ত্র কৌশলে নির্ম্মিত হওয়ায় এই ভুল পদ্ধতি অনুসরণ করার কুফল ফলে নি—যথা, উপমার ভারে সংলাপের প্রাখর্য্য মিইয়ে যায় নি, কাব্যিক উচ্ছ্বাসের জঞ্জালে গল্পের গতি ব্যাহত হয় নি, নাটককে জোর করে মিলনান্ত করার চেষ্টার পরিণতি কৃত্রিম হয়ে ওঠে নি। চরিত্র তৈরীর দিক থেকে 'মেঘনাদ বধ' কৃষ্ণকুমারীকেও ছাড়িয়ে গেছে। 'মেঘনাদ বধে'র প্রতিটী চরিত্র অদ্ভুত রকমের নাটকীয়। 'মেঘনাদ বধ' নাটক নয় বলে খুব সম্ভব এ রচনার সময় কোন সংস্কৃত নাটকের স্মৃতি মধুসূদনের মনে তখন জাগে নি। তাই 'মেঘনাদ বধের' গতি হয়েছে

অমন মুক্ত, অমন সহজ, অমন উদ্দাম। কাব্য হিসাবে 'মেঘনাদ বধ' অপূর্ব্ব ; কিন্তু নাট্যাকারে যে তা আরও অপূর্ব্ব হত, এমন অনুমান বোধ হয় ভুল নয়।

নাট্যপ্রতিভার অর্থ শুধু সংলাপের নিগড়ে কাহিনী আবদ্ধ করার কৌশলই নয়। জীবনকে একটা বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে দেখতে জানার নামই নাট্যপ্রতিভা। সে দৃষ্টিভঙ্গী আত্মকেন্দ্রিক নয়, বস্তুকেন্দ্রিক। subjective নয়, objective। বিরোধ এবং সাগ্রহ প্রতীক্ষা—conflici এবং suspense এই হল নাটকের সার। নিজেকে বিচ্ছিন্ন রেখে জীবনের সর্ব্বব্যাপারে এই conflict এবং suspenseএর খোঁজ পাওয়াই নাট্যকারের কৃতিত্ব। মধুসূদনের যে এ শক্তি ছিল, তা তাঁর জীবন থেকেই প্রমাণ হয়। শৈশব থেকে মৃত্যু পর্য্যন্ত তাঁর জীবনের প্রতিটী ঘটনা নাটকীয়। সাহিত্যের চেয়ে জীবনে তিনি ছিলেন আরও বড় নাট্যকার। কতকগুলি প্রচলিত নিয়ম মেনে একটা কাহিনীকে নাট্যাকারে খাড়া করা—এটা নাট্যপ্রতিভার বাইরের কথা। এর জন্য বিশেষ অনুশীলনের প্রয়োজন—শুধু নিজের নয়, পূর্ব্ববর্ত্তী নাট্যকারদেরও। বঙ্গনাট্যের প্রায় সমস্ত বিভাগেই মধুসূদন প্রবর্ত্তক ছিলেন বলে পূর্ব্ববর্ত্তীদের অনুশীলনের সাহায্য তিনি পান্ নি। এই জন্য তাঁর নাটকগুলি অনেক সময়ে আমাদের কাছে কাঁচা মনে হয়। কিন্তু তা যে নয়, আত্মায়, দৃষ্টিভঙ্গীতে, প্রতিভায়, তিনি যে পরবর্ত্তী কোন বঙ্গদেশীয় নাট্যকারের চেয়ে হীন ছিলেন না, তার সাক্ষ্য তাঁর প্রথম সৃষ্টি 'শর্ম্মিষ্ঠা' না দিক, 'পদ্মাবতী' না দিক, এমন কি, 'কৃষ্ণকুমারী'ও না দিক—দেবে রাক্ষসরাজ রাবণ, দেবে তাঁর পুত্র মেঘনাদ এবং পুত্রবধূ প্রমীলা।

> "বিদেশীয় একখানি কাব্য দত্তক পুত্ররূপে গ্রহণ করিয়া আপন গোত্রে আনা বড় সহজ ব্যাপার নহে ; কারণ, তাহার মানসিক ও শারীরিক ক্ষেত্র হইতে পরবংশের চিহ্ন ও ভাব সমুদায় দূরীভূত করিতে হয়।"
>
> —মধুসূদন

মাছি

নীলিমা সেন

আজ যা ঘটনা, কাল তা ইতিহাস।

একদা সুন্দরী হেলেনার জন্য ট্রয় নগর ধ্বংস হয়েছিল। সে-কালের লোকের কাছে সে দিন সে ব্যাপারটা ছিল ঘটনা কিন্তু আজ আমাদের কাছে তা ইতিহাস।

অবশ্য আপনারা বল্‌তে পারেন, সমস্ত ঘটনাই কি ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্থান পেতে পারে? আমি বলি, সমস্ত ঘটনাই একটু বিশেষ দৃষ্টি দিয়ে দেখ্‌লেই তা স্থান পেতে পারে।—আচ্ছা বলুন, ইতিহাস জিনিষটা কি? কোন বিশেষ দৃষ্টিসম্পন্ন লোক যখন কোনো একটা ঘটনাকে একটু অসাধারণ চোখে দেখে পুঁথির পাতায় লিখে যান, পরবর্ত্তী কালের লোক তখনই তা ইতিহাস বলে পাঠ করেন।

সুতরাং আশা করতে দোষ কি, একদা আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরেরা আমার এই ছোট গল্পটি ইতিহাস বলেই পাঠ করবে! হোক্‌না গল্পটা একটা সামান্য মাছি নিয়ে। হেলেনাও ত কেবল সুন্দরীই ছিলেন, অসামান্য ত কিছু ছিলেন না!

যাক, ভবিষ্যতের ফলাফল ভবিষ্যতের দেবতার উপর ছেড়ে দিয়ে নিরীহ লেখক হিসাবে গল্পটা লিখে যাওয়াই ভাল।

হঠাৎ সেদিন রাত দুপুরে আবিষ্কার করা হ'ল যে আমার কলেরা হ'য়েছে। এ এক চমৎকার অনুভূতি। প্রথম প্রথম বেশ দুর্ব্বলতা অনুভব করতে লাগলুম; পরে মনে হ'তে লাগ্‌লো, আমার সমস্ত শরীর থেকে শিরা-উপশিরাগুলি যেন বিদ্রোহ করে বেরিয়ে আস্‌ছে। আস্তে আস্তে সমস্ত অন্ধকার হ'য়ে এল। থাক্‌লো কেবল সামান্য একটা অবুঝ অনুভূতি। বেশ অনুভব করছি, সবাই ধরাধরি করে আমার দেহটা বয়ে নিচ্ছে। হুহু করে চল্‌ছে দেহটা, সঙ্গে চলেছে আত্মীয় স্বজন। ভাবলুম, এই হয়ত মৃত্যু। মৃত্যুর রাজ্যে নিয়ে চ'লেছে আমার দেহটা। চমৎকার, চমৎকার! আজ আমি এদের মধ্যে থেকেও নেই। সবাইকে আমি বেশ অনুভব করতে পারছি। কিন্তু ওরাও—ঐ পৃথিবীর লোকেরাও—কি আমাকে অনুভব করতে পারছে? বোধহয় না। ঐ যে লম্বা এপ্রণ পরে আমার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বল্‌ছে, কে ও?—ঐ কি যমরাজ? হঠাৎ শরীরের ভিতর একটা সুঁচ্ ফোটার

মত যন্ত্রণা অনুভব কর্‌লাম। মৃত্যুর পরেও কি দেহে অনুভব শক্তি থাকে? ক্রমে ক্রমে অন্ধকার যেন আরো গভীরতর হ'য়ে এল। সমস্ত অনুভূতি ডুবে গেল সেই অন্ধকারের ভিতর। নিথর, নিশ্চল অবস্থায় পড়ে রইল দেহটা।

পরদিন চেয়ে দেখি, লম্বা চওড়া পরিষ্কার ঝরঝরে একটা খাটে শুয়ে আছি। চারিদিকে সারি সারি খাট। ঘণ্টায় ঘণ্টায় আমারই মত লোক আস্‌ছে। কেউ হাস্‌ছে কেউবা কাঁদছে, কেউবা নিঃশব্দে পড়ে আছে। রাত্রের সেই এপ্রণ পরিহিত লোকটি গম্ভীর মুখে যাতায়াত করছে। চারিদিকে অসংখ্য শিশি বোতল। ঘরে বড় বড় দরজা জান্‌লা। কিন্তু প্রত্যেকটা দরজা জানলায় লোহার সূক্ষ্ম নেট। তার ভিতর অস্পষ্ট ভাবে ফুটে উঠেছে আত্মীয় স্বজনের বিষাদ-ক্লিষ্ট মূর্ত্তি।—এই কি যমপুরী?—এখানেও কি দিনের আলো উঁকি ঝুঁকি মারে? শরীরের ভিতর কি একটা কাঁটা ফুট্‌তেই চেয়ে দেখি, সেই গম্ভীর লোকটা কি একটা যেন শরীরের ভিতর ফুটিয়ে দিচ্ছে। তার আশে পাশে একই রকম আলখাল্লা পরিহিত কয়েকজন লোক এবং সাদা ধব্‌ধবে কোঁচান টুপী মাথায় কয়েকজন মেম। আস্তে আস্তে সবই পরিষ্কার হ'য়ে এল। বুঝ্‌লুম, এটা হাসপাতাল। বাইরের সুস্থ সবল লোকদের প্রবেশাধিকার নেই এখানে। এখানে যারা একবার প্রবেশ করবার অধিকার পায়, হয় তারা সোজাসুজি যমপুরীতে চালান হয়, নতুবা যমপুরীর সামান্য একটু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেই ফিরে আসে। যমরাজ্যের Custom Houseই হ'চ্ছে এই হাসপাতাল। মৃত্যুর পর অভিজাত্যের অনভিজাত্যের যেমন বিভেদ থাকে না, মৃত্যুর পূর্ব্বেও ঠিক তেমনি এখানে কোন পার্থক্য নেই।—এখানে সবাই সমান। এ যেন পৃথিবীর মধ্যে থেকেও এক বিভিন্ন জগৎ। চল্‌তি দুনিয়ার সাথে এর কোন মিল নেই, তাই এখানকার লোকদের নেই কোন নাম ধাম। বেড্ নম্বর অনুসারেই এখানে সবাই পরিচিত। আপনি যদি 'হেল্‌লো মিস্টার অমুক' বলে এখানে কাউকে সম্বোধন করেন, তবে অমুক নামের সেই ভদ্রলোক হয়ত মুখখানা প্রশ্নবোধক চিহ্নের মত করে ভাব্‌বেন, এ আবার কোন দেশী কথা?

দিন রাত চুপ করে শুয়ে থাকা অসহ্য। উঠে বেড়াবার না আছে সামর্থ, না আছে অধিকার। শুয়ে শুয়ে দেখ্‌ছি, ১৭নং বেডের সেই লোকটা—যে এই কিছুক্ষণ হ'ল এসেছে—ভীষণ চীৎকার করছে। মাঝে মাঝে শিশির ভাদুড়ীর 'সীতা' অভিনয় করছে। কখনও বা উঠে পালাতে চাচ্ছে। দু-তিনজন কুলী নির্ম্মম হাতে জোর করে শুইয়ে দিচ্ছে। ডাক্তার এসে একটা ইন্‌জেক্‌সান দিতেই সে নিস্তেজ হ'য়ে পড়ে রইল। ঘণ্টাখানেক পরে ডাক্তার আবার তাকে পরীক্ষা করে কুলীদের আদেশ দিলেন, কালো পর্দ্দা টানিয়ে দিতে। ১৪নং

বেডের ভদ্রলোক একটা অর্থপূর্ণ দৃষ্টি নিয়ে তাকাল আমার দিকে, এখানকার এ ক'দিনের অভিজ্ঞতায় আমি বেশ জানি—এ কালো পর্দ্দার অর্থ কি!

আমার বেডের বিপরীত দিকে ৩৩নং বেডে এসেছে একটী ৬।৭ বৎসরের বালক। যতক্ষণ সে অজ্ঞান ছিল, বেশ ছিল, কিন্তু জ্ঞান হবার সাথে সাথে সে বেশ বুঝতে পারলো এ আর এক নতুন জগতে সে স্থান নিয়েছে। ছোট অবুঝ মানব সন্তান সে—মার বুকেই এখন পর্য্যন্ত মা-নায়, দীর্ঘ সাত বৎসরের অভিজ্ঞতায় সে মার বুক ছাড়া অন্য কোন জগতের সাথেই পরিচিত হ'তে পারেনি। তার কাছে এ স্থান একটা নতুন বিস্ময়কর—হয়ত বা ভয়ংকর।

আশ্চর্য্য হ'য়ে সে তার আশ্চর্য্যময় চোখ দুটি দিয়ে চেয়ে দেখলো সমস্ত ঘরখানা। হয়ত খুঁজলো শান্তির আধার তার মাকে, অথবা হয়ত নিজেকেই এই পারিপার্শ্বিকতার সাথে মানিয়ে নিতে চেস্টা করলো। কিন্তু ভয় পেল। চীৎকার করে কেঁদে উঠলো। নার্সের ধমকে কান্না তার থেমে গেল বটে, কিন্তু চোখে মুখে গভীর ভাবে ফুটে উঠলো ভয়ের চিহ্ন। সে পরিষ্কার বুঝতে পারলো যে নার্সরা যদিও নারী তথাপি তার মা এবং নার্সদের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে—মার আছে অপত্যস্নেহ আর নার্সদের আছে কর্ত্তব্যপরায়ণতা।

আবেষ্টনহীন কর্ত্তব্যপরায়ণ এই নিষ্ঠুর ঘরখানাকে যেন আরো বেশী নির্দ্দয় বলে মনে হ'ল।

ডাকলুম, 'ওহে ৩৩ নম্বর বেডের খোকা, শোন!'

মানুষের এই স্বাভাবিক কণ্ঠস্বরটুকুই যেন তাকে প্রেরণা দিল। একটা আনন্দের ঢেউ খেলে গেল তার মুখাবয়বে। এতটুকু আন্তরিকতাও বোধ হয় সে এখানে আশা করেনি।

সুতরাং সামান্য একটু দরদভরা কণ্ঠে ডাকতেই সে ছুটে এল আমার বেডের ওপর। সহানুভূতিতে তার হাতখানা ধরতেই খোকার দুচোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগলো।

বুঝলুম, সে চায় সান্ত্বনা। কিন্তু নিজেই যেখানে পরাধীন, অক্ষম, সেখানে সে অপরকে কি বলে সান্ত্বনা দেবে? কিছুই না বলে আস্তে আস্তে তার পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলুম। ভারপ্রাপ্ত সিস্টারের চোখে ব্যাপারটা পড়তেই সে ছুটে এসে একটু রুক্ষস্বরে বল্লে, দেখ বাবু, নিয়মবহির্ভূত কোন কাজ করার এখানে কোন অধিকার নেই।

তবু ভাল যে এটুকুতে অন্ততঃ চল্‌তি দুনিয়ার সাথে মিল আছে। তবু বল্লুম, নিয়মের বাইরে কোন কাজ করার কোন খানেই অধিকার নেই, কিন্তু জান্‌তে পারি কি, হঠাৎ কি এমন নিয়মবহির্ভূত কাজ করে ফেল্লুম!

এক বেডের রোগীর অপর বেডে যাওয়া নিষিদ্ধ ; তা বোধ হয় জান ?

না, জানি না, আচ্ছা জিজ্ঞাসা কচ্ছি—একজন অপরের কাছে যদি যায়-ই তাতেই বা হাসপাতালের শৃঙ্খলা ভঙ্গের সম্ভাবনা কোথায় ?

শৃঙ্খলা ভঙ্গের সম্ভাবনা না থাক্‌লেও একের থেকে অপরের মধ্যে রোগের বীজাণু সংক্রামিত হওয়াই সম্ভব।

একঘরে এতগুলি রোগী পাশাপাশি থাকা সত্বেও যদি বীজাণু সংক্রামিত না হয়, ত একজন অপরের বিছানাতে বস্‌লেই কি আর বেশী হ'বে।

উত্তরে সিস্টার আর কোন কথা না বলে খোকাকে ধরে নিয়ে তার বিছানায় শুইয়ে দিল।

মনটার ভিতর কিরকম বেসুরা বেজে উঠলো, চুপ করে শুয়ে থাকতে থাকতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলুম, হঠাৎ একটা কোলাহলে ঘুম থেকে জেগে উঠি।—একি আশ্চর্য্যময় ঘটনা, এ শান্ত বৈচিত্রহীন জগতে কে আন্‌লো এই মহাচাঞ্চল্য ?—কে সে মহাশক্তিধর ? জিজ্ঞাসু চোখে সমস্ত ঘরখানা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে চেয়ে দেখলুম। নতুনত্বের কিছুই দৃষ্টিগোচর হ'ল না। ১৭ নম্বর বেডটা – যেটা এই কিছুক্ষণ হ'ল খালি হয়েছিল – সেটায় এক ব্যক্তি নিথর, নিশ্চল অবস্থায় পড়ে আছে—মৃত কি জীবিত বুঝবার উপায় নাই। নতুনত্বের কিছুই নেই, তবু সবার চোখে মুখে একটা চঞ্চল ভাব। সেই গম্ভীর ডাক্তার সাহেবটী পর্য্যন্ত যেন বেশ একটু চঞ্চল হ'য়ে উঠেছেন। অতিরিক্ত কয়েকজন কুলীও দেখছি এসেছে। সবাই ব্যস্তভাবে এদিক ওদিক চলাফেরা করছে। সবার-ই হাতে ফ্লিটের পিচকারী, ঘরের প্রত্যেকটী পাখা পরিপূর্ণ শক্তিতে বন্‌ বন্‌ করে ঘুরছে। সাম্‌নে চেয়ে দেখি, সেই খোকাটীর চ'খে মুখেও একটা কৌতূহলের ভাব। আশ্চর্য্যের উপর আশ্চর্য্য হ'য়ে গেলুম সেই অদৃশ্য শক্তির ক্ষমতা দেখে, যে এই অল্প সময়ের ভিতরে ভীতির পরিবর্ত্তে এনে দিতে পেরেছে একটা কৌতূহল ঐ অসহায় অবুঝ মানব সন্তানটীকে। কিন্তু সমস্যা রইল তখনও অমীমাংসিত।

মিলিত কণ্ঠের 'ঐ ঐ' শব্দের অনুসরণ করে দেখি, দিব্যি পরিপুষ্ট নানারংয়ের সংমিশ্রণে এক অপরূপ দেহ বিশিষ্ট মাছি বোঁ বোঁ উড়ে বেড়াচ্ছে। সবাই ছুটলো সে দিকে ফ্লিট হাতে। কিন্তু আশ্চর্য্য, মাছিটী ঠিক্‌ ডাক্তার সাহেবের মুখের উপরেই যেন ব্যঙ্গভরেই বোঁ বোঁ করে নির্ব্বিবাদে এবং নিরাপদে অদৃশ্য হ'য়ে গেল। ফলে একটা চটাস্‌ করে শব্দ এবং সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার সাহেবের গাল্‌টী লাল হ'য়ে উঠলো। ক্ষোভে, দুঃখে, লজ্জায়,

রাগে ডাক্তার সাহেব ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। একটা কৌতুকের চমকানি ক্ষণিকের জন্যে খেলে গেল সবার ভিতর ; সঙ্গে সঙ্গেই এল ভয়ের মেঘ করে।

একটী কুলিকে ডেকে এতক্ষণে জানতে পারলুম, সে মহাপুরুষের বীরত্ব-কাহিনী। প্রবেশ তিনি করেছেন কখন কোন এক অজ্ঞাত মুহূর্ত্তে, কারো অসাবধনতার সুযোগে, কেউ তা লক্ষ্য করেনি। এবং লক্ষ্য করার প্রয়োজনও থাক্‌তো না, যদি-না তিনি সময় বুঝেই তার আবির্ভাবের বার্ত্তা সরবে ঘোষণা করতেন।

১৭ নম্বর বেডে যে রোগীটী এসেছে তার অবস্থা অত্যন্ত সংকটাপন্ন। ব্যস্ত হ'য়ে ডাক্তার সাহেব গেছেন ইন্‌জেক্‌সন দিতে। সবাই প্রস্তুত। ইন্‌জেক্‌সন দেবে দেবে, ঠিক সেই মুহূর্ত্তে ডাক্তার সাহেবের মুখের উপরই বোঁ বোঁ করে মাছিটী তার উপস্থিতি জানিয়ে দিল। ফলে, ইন্‌জেক্‌সানের সিরিন্‌জ্‌ হাত থেকে পড়ে ভেঙ্গে চুরমার হ'য়ে গেল। থাক্‌ল মরণোন্মুখ রোগী আর তার ইন্‌জেক্‌সানের সরঞ্জাম। ডাক্তার সাহেব বেরিয়ে গেলেন হাত মুখ ধুতে। সঙ্গে সঙ্গে হুকুম দিয়ে গেলেন, যে ভাবেই হোক্‌ মাছিটিকে মেরে ফেল্‌তে হবে। নতুবা এই এপিডেমিকের সময় হতভাগা মাছিটা রোগের বীজাণু নিয়ে সমস্ত সহর ছারখার ক'রে দেবে।

কিন্তু আশ্চর্য্য, মাছিটা যেন ডাক্তার সাহেবের কড়া আদেশ শুন্‌তে পেয়েই তাঁর আদেশ উপেক্ষা ক'রেই প্রত্যেক বার তার উপস্থিতি ডাক্তার সাহেবের মুখের উপরই জানিয়ে দিচ্ছে।

নানা উপায় উদ্ভাবন করা হ'ল ওকে ধ্বংস করার জন্য। অথচ প্রত্যেক অব্যর্থ লক্ষ্য সে অর্জ্জুনের মত ভেদ ক'রে নিরাপদে বেরিয়ে আস্‌ছে।

আবার বস্‌লো নতুন করে জটলা। ঘরের সমস্ত পাখা বন্ধ। স্থানে স্থানে রাখা হ'ল উপাদেয় খাদ্য। অবশ্য মাছি সম্প্রদায়ের কাছে যা উপাদেয়। প্রত্যেক স্থানের রক্ষী হিসাবে থাক্‌ল এক একজন কুলী, হাতে বেত মাথায় বিনুনী বাঁধা। আর সব মিলিয়ে পরিদর্শন করে বেড়াচ্ছেন মাছিটীর একমাত্র প্রতিপক্ষ ডাক্তার সাহেব। ভাবলুম, লোভের ফাঁদ পাতা—হয়ত অব্যর্থ। মনটা কেমন খারাপ হ'য়ে গেল। মনে পড়লো, সেই পুরানো কথা 'লোভে পাপ পাপে মৃত্যু'। লোভের জন্যই সৃষ্টি হ'য়েছে ভারতের আদি কাব্য রামায়ণ, মহাভারত। এ ত সামান্য মাছি। না না, সামান্য নয়, অতীব শক্তিমান। তাই হয়ত সে এই ফাঁদেই ধরা পড়বে।

ঘট্‌লোও তাই। যে কুলীটি এই বীরোচিত কাজ করেছে ডাক্তার সাহেব তাঁর নিজের পকেট থেকে তাঁকে পাঁচটি টাকাই পুরস্কার দিয়ে দিলেন। আর আমার ইচ্ছে করলো,

মাছিটিকে সোণা দিয়ে মুড়িয়ে চিরস্মরণীয় করে রাখি। কিন্তু একে অক্ষম, তার উপর অর্থক্লিষ্ট বাঙালী যুবক আমি। সুতরাং এ ইচ্ছাকে সদিচ্ছা বলা চলে না। বাঙালীর পক্ষে যা সম্ভব অর্থাৎ গল্প লেখা, আমিও তাই করছি। উদ্দেশ্য মাছিটিকে চিরস্মরণীয় করে রাখা।

নতুন উদ্যমে নতুন করে ডাক্তার সাহেব বিজয়ী বীরের মত ১৭ নম্বরের রোগীটীকে ইন্‌জেক্‌সান দিতে গেলেন।

হঠাৎ কি হ'ল, তিনি ফিরে এসে মুখ কুচকিয়ে কুলীদের আদেশ দিলেন, ১৭ নম্বর বেডে কালো পর্দ্দা টান্‌তে।

"মহাকাব্যের মধ্যে একটা উন্মুক্ত অকৃত্রিম স্বাভাবিকতা আছে, তাহা বোধ করি আর কখনও ফিরিয়া আসিবে না। সুনিপুণ শিল্পী একালে তাজমহল গড়িতে পারেন, কিন্তু পিরামিডের দিন বুঝি একেবারে চলিয়া গিয়াছে। মহাকাব্যগুলিকে আমরা মহাকায় অদ্ভুত পিরামিডের সঙ্গে তুলনা করিতে পারি। এক একবার মনে হয়, উহাদিগকে কোন মানবহস্ত নির্ম্মিত কারু-কার্য্যের সহিত তুলনা না করিয়া প্রকৃতির হস্ত-নির্ম্মিত নৈসর্গিক পদার্থের সহিত উপমিত করা উচিত।" —রামেন্দ্রসুন্দর

উই

সুশীল রায়

তোমার আমার দু'জনার নামে
পাড়ায় পড়িল টি-টি—
যেহেতু আমার কেনা কার্পেটে
লিখেছিলে A. B. C. D…

এতেও হয়ত' আপত্তি কা'রো
হ'তোনা, যদি-না তা'তে
রবিঠাকুরের দু'লাইন লেখা
জুড়ে দিতে কবিতাতে!

প্রেম-টা নেহাৎ বেনোজল, তা'র
আসা-টা লাগায় তাগ্।
ভাবিনি, সূতোর অ্যাল্‌ফাবেটেই
প্রেমের প্রথম-ভাগ।

প্রথম-ভাগেই পড়া ইস্তফা
দিয়েছি, মূর্খ আমি—
ক'রেছি A. B. C.-লেখা কার্পেট
প্রেমের চেয়েও দামী।

অতএব তা'কে বাক্স-বন্দী
ক'রেছিনু ভাঁজ ক'রে
হঠাৎ-খেয়ালে খুলে দেখিলাম
আজ বহুদিন পরে!—

উইপোকা চেনো ? বেরসিক উই ?
চেনো তো ? তাহ'লে শোন—
কার্পেটটাকে কেটে কেটে তার
চিহ্ন রাখেনি কোনো।

পোকা বেছে বেছে দেখি, অক্ষত
দু'টি অক্ষর আছে,
আর কোনোটাই পায়নি রেহাই
উইপোকাদের কাছে।

'E' ও 'W'—দু'টি অক্ষর
নেহাৎ ভাগ্যবান্
পোকার দাঁতের দাগ থেকে তাই
পেয়েছে পরিত্রাণ।

অক্ষর দু'টি মিলিয়ে মিলিয়ে
পাশাপাশি যেই থুই—
দেখি, তুমি নাই ; দেখি, আমি নাই ;
কেবল র'য়েছে WE।

প্রাকৃতিক

(উপন্যাস)

প্রথম খণ্ড : চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সরোজকুমার মজুমদার

শীতের রোদ আধ-খোলা জানালা দিয়ে এসে শীলার মুখে রূপালী-স্পর্শ মাখিয়ে দিলো।

শীলা চোখ মেলে চাইলো। উঃ! শেষ রাত্রের দিকে কী ঘুমটাই দেওয়া গেছে,—. এখনো কিন্তু মালিন্য একটু-ও কাটেনি,—সারা মুখে আঠার মতো ঘুম চিটিয়ে র'য়েছে। আরেকটু ঘুমুলে কিন্তু মন্দ হ'তো না!

কাল রাত্রে প্রকাশ এসেছিলো ওর কাছে। কত কথাই-যে ওদের মধ্যে হ'লো তা'র ইয়ত্তা নেই। প্রকাশ ওর সামনে নত হ'য়ে প'ড়ে ব'লেছিলো আর কখনো সে এমন ক'রে পালিয়ে যাবে না। আদর করে প্রকাশ আরো কি ক'রতে উদ্যত হ'য়েছিলো, এমন সময় ময়দানে কিসের তোপ প'ড়লো। সেই আওয়াজে ওর ঘুম গেল ভেঙ্গে। রাত তখন হবে! একটা? না, আরো বেশী বোধ হয়, দুটো! তারপরে বাকি রাত-টুকু সে ঘুমিয়েছে অবিশ্যি গভীর ভাবেই, প্রকাশ কিন্তু আর আসে নি।

শুয়ে শুয়েই শীলা ওর দেহ সঙ্কুচিত ও প্রসারিত ক'রে নিয়ে নিদ্রা-জনিত জড়তা কাটিয়ে নিলো।

ঢন্-ঢন্ ক'রে ঘড়িতে আওয়াজ হ'তেই শীলা চেয়ে দেখলো। ওঃ! আটটা! সাড়ে আটটা থেকে ন-টার মধ্যে সুষমার হস্‌টেল্‌এ এনগেজমেণ্ট্‌ আছে যে! ওর একদম মনেই ছিলো না।

ত্রস্তে লাফিয়ে উঠলো বিছানা থেকে। খাটের তলা থেকে লপেটা-জোড়া বাঁ-পা দিয়ে টেনে নিলো।

আরো দশ মিনিট পরে দেখা গেল, সে সুষমার কাছে যাবার জন্যে প্রস্তুত হ'য়ে গেছে।

ড্রইং-রুমে অনাদিবাবু সদ্যপ্রাপ্ত খবরের কাগজ পড়ছিলেন। চশমা উঁচু করে জিজ্ঞাসা করলেন,—এত সকালে কোথায় যাচ্ছো মা?

—একটু সুষমার সাথে দেখা ক'রতে হবে বাবা।

—ওঃ! অনাদিবাবু খবরের কাগজের একটা পাতা উলটিয়ে নিলেন,—এই দেখ, দেখ, যুগোশ্লাভিয়ায় কী মজার এক কাণ্ড হ'য়েচে। একটা মানুষের পেট থেকে—

দরজার দিকে নিজেকে চালিত ক'রে শীলা ব'ললে,—সে আমি এসে দেখবো বাবা! সাড়ে আটটার মধ্যেই আবার সুষমার সঙ্গে এন্‌গেজমেন্ট।

অনাদিবাবু স্বচ্ছ হাসিতে গ'লে গেলেন। পরে ব'ললেন,—বেশ, বেশ! তবে যাও! ড্রাইভার উঠেচে কী?

শীলা ততক্ষণে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেবে গেছে, গলা উঁচিয়ে ব'ললো,—দরকার হবে না;—বাসেই যাচ্ছি।

ট্র্যাম থেকে নেবে দু'পা এগিয়ে এলে ডান হাতেই গীর্জ্জা পাওয়া যায়—তারই লাগোয়া সুষমাদের কলেজ। হস্‌টেলের ফটক পাওয়ার জন্য শীলাকে মোড় ঘুরতে হ'লো।

কাঠের গ্যেট ভেজানো ছিলো। নরম হাতে শীলা ফটক-দুটো একজন লোক স্বচ্ছন্দে চলে যেতে পারে এতটা ফাঁক ক'রে নিলো। পাশেই দরোয়ানের কুঠরী। দরজার সামনে একটা টুলে ব'সে সে কী-একটা বই প'ড়ছিলো। ওকে দেখেই হন্ত-দন্ত হ'য়ে ছুটে এলো।

—সেলাম দিদিসা'ব।

—হাঁ, সেলাম! সুষমা দিদি আছে? চেনো তো? সুষমা সেন!

দরোয়ান একগাল হেসে ব'ললো,—নেই দিদিসা'ব। সুষমা দিদিকে হামি চিন্‌তে পারচিনি, হামি তো হিঁয়া খালি পাঁদরো রোজ এসেচি। পহ্‌লে হামি বিক্‌ট্‌রী ইস্‌কুল্‌মে ছিলাম। মগর আপ্ সিলেট্‌-মে লিখ দিজিয়ে হামি দিয়ে আসচি মেম-সাবকে।

—আনো, শ্লেট্ নিয়ে এসো, শীলা ব'ললে।

দরোয়ান দ্রুত ওর দ্বারে গিয়ে পেরেকে ঝোলানো শ্লেট এবং একটা চক্-ষ্টিক্ নিয়ে এলো। শীলাকে দিয়ে ব'ললে,—লিন্।

গোটা কয়েক অক্ষরে ও প্রথমে লিখলে সুষমার নাম। পরে নীচে নিজের নাম সই ক'রে তারিখ দিয়ে দিলো।

দরোয়ান শ্লেট নিয়ে গেলো এবং পাঁচ মিনিটের ভেতরই ফিরে এলো।

—আপনি সুষমা দিদির কাম্‌ড়া চিনেন তো সিধা উনার কাছে চলে যান—নাই চিন্‌হেন্ তো হামার সাথে চ'লে আসুন। মিসিবাবা কহা কি, উন্নার গোড়মে একঠো দরদ্ হ'য়েচে—ইসলিয়ে আসতে পারলেন না। আসুন!

শীলা এর পূর্ব্বেও তিনবার সুষমার হস্‌টেলে এসেচে। পথ-প্রদর্শকের কাজ হ'তে দরোয়ানকে অব্যাহতি দিয়ে ও সুষমার ঘরে এসে পৌঁছোলো।

সুষমা বিছানায় ডুবে ছিলো। পিঠের ও কাঁধের নীচে গোটা-কয়েক বালিশ দিয়ে মাথাটা উঁচু ক'রে রেখেচে। পা-থেকে কোমর অবধি একটা লেপ টানা আছে।

সুষমা একটু সোজা হ'য়ে বসার চেষ্টা ক'রতে ক'রতে ব'ল্‌লে—এসো!

বার্ম্মিজ-ছাতা দুই দেওয়ালের কোণে রেখে শীলা এগিয়ে এলো। সুষমার খাটের পাশে বেঁতের চেয়ারে ব'সতে ব'সতে শুধোলো,—তোমার পায়ে নাকি কি হ'য়েচে, দারোয়ান ব'ললে!

—হুঁ! তেমন কিছু নয়, পরশুদিন দেখলাম একটা ফোঁড়া হ'য়েচে এই জায়গায়।

সুষমা লেপের বাইরে বাঁ-পা টেনে আনলো। ব'ললো,—ভয়ানক ব্যথা। যাকগে ব্যথা! কোন কিছুই হ'লো না। পুলিশে ব'লেছিলো একটা লোকের সন্ধান তারা পেয়েছে—সে দাদা কিনা তার সঠিক খবর গত কাল দেওয়ার কথা ছিলো। খবর কাল ওরা দিয়েছে। কিন্তু—যাক্, দাদাকে একেবারেই হারিয়েছি। বৃথাই হবে খোঁজা।

শীলা কিছুই ব'ললে না। ওর দৃষ্টি নমিত হ'য়ে আছে।

খানিকক্ষণ সম্পূর্ণ স্তব্ধতার পরে সুষমা হঠাৎ ব'লে উঠলো—ওঃ! ভালো কথা, সুনীলদা এখানেই আছেন শীলা—কাল বিকেলে আমার সাথে দেখা কর্ত্তে এসেছিলেন।

শীলা সামান্য ঔৎসুক্যের সঙ্গে শুধু প্রশ্ন করলে,—তারপর?

স্নিগ্ধস্বরে সুষমা ব'লতে থাকে,—ব'ললেন, এখানেই বরাবর ছিলেন। সাধারণতঃ সমাজে কারুর সাথেই বড় একটা মিশতেন না। দাদার খোঁজ ক'রে যে সব বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম কাগজে, তারই একটায় হঠাৎ একদিন ওঁর চোখ পড়ে। ছুটে গেছেন তারপর আমাদের বাসায়—বিস্মিত হ'য়ে দেখেন, সেখানে নতুন ভাড়াটে! তাঁদের কাছে খোঁজ ক'রলেও তারা আমার সম্বন্ধে কিছুই ব'লতে পারে নি।

—তারপর? শীলা নিজের থেকেই আরেকবার প্রশ্ন ক'রলে।

—তারপর বাড়ী-ওলার কাছে গিয়ে আমার হসটেলের ঠিকানা জোগাড় ক'রলেন। এ-টা পশু'র ঘটনা। আমার কাছে অকস্মাৎ আবির্ভূত হ'লেন কা'ল, সন্ধ্যার সামান্য আগে!

শীলা দুই হাত দিয়ে চুলের খোঁপা একটু স্পর্শ ক'রে ব'ললো,—কী ব'ল্‌লেন? খুব আহত হয়েচেন নিশ্চয়ই?

—হু! সুষমা পায়ের উপর থেকে লেপটা সরিয়ে নিলে, পূবের জানালা দিয়ে রোদ এসে ঠিক মুখের উপরে প'ড়েছিলো। ডান পাশের পাল্লাটা দিলে বন্ধ ক'রে। তারপর

ব'ললো, ওর সাথে দাদার বন্ধুত্ব ছিল ওরা যখন সাউথ সুবার্ব্বানে সেকেণ্ড ক্লাশে পড়তেন—সেই থেকে। কী রকম শক্ পেয়েছেন তা ওঁর মুখ দেখলেই বুঝতে। বেশী কিছুই ব'ললেন না,—যাবার আগে ব'লে গেলেন,- সে আসবেই। আজ না আসুক, কাল না আসুক, নিশ্চয়ই সে একদিন ফিরে আসবে। প্রকাশ আমাদের সঙ্গে এমন শত্রুতা ক'রতে কখনই পারে না। একটু থেমে নিয়ে আবার সুষমা ব'ললো. আর ব'ললেন, প্রকাশ যে এমন সেন্টিমেণ্টাল হবে তা কোন দিনই ভাবিনি।

সুষমার কথার প্রতিধ্বনি করে শীলা লঘুস্বরে বললো,—সেন্টিমেণ্টাল! তারপর ফ্যাকাশে একটু হাসলো।

সুষমা বিছানা থেকে উঠতে চেষ্টা ক'রে ব'ললো,—চা খেয়ে এসেচো? চা দিতে বলি?

—হাঁা, এক পেয়ালা দরকার। খেয়ে আসিনি, ঘুম থেকে উঠতে আজ যথেষ্ট বেলা হ'য়েছিলো।

খোঁড়াতে খোঁড়াতে সুষমা বারান্দার দিকে অগ্রসর হচ্ছিল।

শীলা ওকে থামিয়ে বললো,—কষ্ট হচ্ছে, যাওয়ার কী দরকার? এখান থেকেই বলো না ভাই।

—নাঃ, কষ্ট বিশেষ হবে না, এ-টুকু চলে যাবো কোন রকমে। সুষমা মিষ্টি হেসে বললো,—তা-ছাড়া আমার নিজেরও একটু দরকার আছে।

সুষমা চলে যেতে শীলা আবার এসে চেয়ারে বসলো। ড্রেসিং টেবিলের দিকে মুখ করে আয়নায় নিজেকে একবার দেখে নিলো। আয়নার মধ্যে হঠাৎ প্রকাশকে দেখতে পেয়ে ওর বুকের মধ্যে ধ্বক্ করে উঠলো। ফিরে চাইলো পেছন দিকে,—দেখলো দেওয়ালে প্রকাশের বুক পর্য্যন্ত একটা অঁয়েল পেন্টিং—প্রকাণ্ড সাইজের। একটু পাশ ফিরে প্রকাশ দাঁড়িয়ে আছে। মুখের বাঁ-দিকটা সম্পূর্ণই ক্যামেরাতে ধরা প'ড়ে গেছে; ডান দিকের শুধু চোখটা। টক্-টকে লাল রং-এর ডোরা কাটা সার্ট—তার উপরে ফিকে নীল রং-এর বুক-খোলা কোট্! কোটের বুক-পকেট থেকে একটা রুমাল শাদা মুখ বার করে উঁকি মারছে, তার সামনে আল্‌গাভাবে একটা ফাউন্টেন-পেন। চুলগুলো কী চমৎকার দেখাচ্ছে। প্রকাশ যে-সময় শীলার কাছে নিজেকে সম্পূর্ণ প্রকাশিত করেছিল—তখন একদা ছেলে-মানুষের মতো সে শীলাকে বলেছিলো, জানো, চুল আমার কতো সুন্দর,—ভাবি, ভগবান আমাকে চুলের এত ঐশ্বর্য্য দিয়েচেন কেন? হাত দিয়ে দেখবে কেমন কোমল, কেমন মসৃণ! শীলা মুখ ঘুরিয়ে বলেছিলো, ভালো না ছাই। বাবারে! নিজের সম্বন্ধে তুমি এত-ও বলতে

পারো! আবার একটু পরিহাস ক'রে বলেছিলো,- আমি কী কখনো কাউকে ঢাক পিটিয়ে বলি-যে আমার দাঁত অবিকল মুক্তার মতো। এমনি কতো আজে বাজে বিষয় নিয়েই যে তখন ওরা মাথা ঘামিয়েচে তার আর ইয়ত্তা নাই। দেখেই শীলা বুঝতে পারলো এ-চেহারা প্রকাশের আগেকার। তখনকার, যখন ওর মা বেঁচে ছিলেন। কারণ এমন স্নিগ্ধ হাসি-মুখ তারপরে কেউ কোনদিন দেখেনি প্রকাশের মুখে। আচ্ছা এ-ছবিটা তো আগে কখনো ও দেখেনি! ওঃ! মনে পড়েছে, সেদিন সুষমা বলেছিলো বটে, দাদার একটা ছবি সে অয়েল-পেন্টিং করতে দিয়েছে। সুষমা লক্ষ্মী মেয়ে! দাদার স্মৃতি বাঁচিয়ে রাখতে তার উৎসাহের সীমা নেই! আবার ছবিটা সে টাঙিয়েছেও এমন চমৎকার যায়গায় যে যে-কোন দৃষ্টি-কোণ থেকেই তুমি সে দিকে চাও না কেন, ছবিটা সমান আনন্দ দেবে তোমায়।

এমন একটা ছবি শীলা পায় না? অয়েল পেন্টিং দূরের কথা প্রকাশের সামান্য একটা পোস্ট-কার্ড সাইজের ছবিও নেই ওর কাছে। শীলা অনেক ঘটনা শুনেছে-যে তোমাকে যদি একজন ভালবাসে তবে, সাধারণত, সে তোমাকে প্রথমেই একটা ছবি উপহার দেবে এবং তোমার কাছ থেকে তোমার তেমনই একটা ছবি নেবে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! শীলাদের ক্ষেত্রে কিন্তু এই নিতান্ত প্রাথমিক আদান-প্রদানটাও হয় নি। প্রকাশের যে-কোন রকম একটা ছবি সুষমার কাছে থেকে ও চেয়ে নেবে নাকি? সুষমা নিশ্চয়ই দেবে—আনন্দের সঙ্গেই দেবে। কিন্তু, কেমন যেন একটা সঙ্কোচ আসে। এ-কথা যে কী ক'রে উত্থাপন করা যায় সেও একটা সমস্যা। আচ্ছা, দেখাই যাক্, এখানে কোথাও যদি থাকে। টেবিল এবং দেরাজের সমস্ত জিনিষ ত্রস্তে উল্‌টিয়ে পাল্‌টিয়ে দেখতে দেখতে, তা'র ভাগ্য ভালো, সে প্রকাশের অনেকগুলো ছবি পেয়ে গেলো। বড়ো, ছোট সব রকমের মিলিয়ে আট-দশটা তো হবেই। দরজার দিকে ভীরুভাবে একবার তাকিয়েই সে চট্ ক'রে দু-টো ছবি তুলে নিলো। সেগুলো রেখে দিলো বুকের আর ব্লাউজের মধ্যকার জায়গায়। আশ্চর্য্য, জীবনে সে, যতদূর তা'র স্মরণ হয়, এই প্রথম চুরী করলো। এটা একটা স্মরণীয় ঘটনা। মৃত্যুর পূর্ব্বমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তার মনে থাকবে, যে-জিনিষ সে আজ অপহরণ ক'রলো, তা'র জন্যে তা'র বিন্দুমাত্র অনুতাপ নেই—যদিও উপায়টা অত্যন্ত হীন।

শান্তিদির পাঁচ বছরের ছেলে আগুনে পুড়ে গিয়েছিলো। শান্তিদি তার একটা প্রতিকৃতি কী চমৎকার ভাবে মিনা করার মতো করিয়ে নিয়েছে তা'র হারের লকেটে। সে প্রকাশের এই ছবিটা, খালি গায়ের এই ছবিটা, ঠিক অম্‌নি ক'রে বানিয়ে নেবে। প্রকাশ সব সময়েই থাক্‌বে তার কাছে—কেউ টেরও পাবে না।

চেয়ার ছেড়ে ও সুজনী-পাতা বিছানায় গিয়ে ব'সলো। বাঁ-হাতের কনুই বালিশে ভর করিয়ে দেহ দিলো অর্দ্ধ প্রসারিত ক'রে।

ভালই হ'য়েছে—সুনীল এসেচে সুষমার কাছে ফিরে। বেচারী একটু শান্তি পাবে এই মানসিক বিপ্লবের সময়। পরীক্ষাটা হ'য়ে গেলেই সুষমা সুনীলের গলায় মালা তুলে দিক্—নইলে ও থাক্‌বে কী ক'রে ? আত্মীয়হীনা হ'য়ে কী ক'রে মানুষে বেঁচে থাকে !

সুষমা ফিরে এলো—চাকরের হাতে দু-থালা খাবার আর দু-বাটী চা।

ছোট একটা তে-পায়া টেনে নিয়ে চা-খাবার রেখে সুষমা দু-পাশে দু-টো চেয়ার টেনে নিলো।

শীলা ব'ললো,—খাবার কেন ? আমি শুধু চা-ই খাবো। এক পেয়ালা—বরং দু পেয়ালাতেও আপত্তি নেই।

সুষমা একটু হেসে ব'ললো—কেন, খাবার কী দোষ ক'রলো ? খেয়ে আসোনি সকালে বললে !

—আসিনি তা' ঠিক। কিন্তু ইচ্ছা নেই এখন ও সব খাওয়ার।

সুষমার আতিথেয়তা বিখ্যাত। ব'ললে—কিছুনা ? খাও দু স্লাইস্ রুটি আর এই পুডিংটুকুন অন্ততঃ।

শীলার এবার ভারী হাসি পেলো—আমাকেও শেষে তোমার অনুরোধ ক'রতে হবে সুষমা ?

—হ্যাঁ, হবে ! কেন অমন করো ? আমিই তো সব খাবো। তুমিও কিছু কিছু খাও—নইলে ছাড়ছিনা।

—আস্ত পাগল তুমি, শীলার মুখে স্বচ্ছ হাসি খেলে গেল, বেশ, এই নাও ! একটা রুটি তুলে নিলো।

সুষমা ব'ললো,—ওঃ ! ভালো কথা, সুনীলদা' কা'ল বেলা তিনটের সময় তোমার কাছে যাবে দেখা ক'রতে। কা'ল কী বার, সোমবার না ? হ্যাঁ, কালই। বুঝলে ? আর ঐ দেখো দাদার ফটোর অয়েল পেন্টিং হ'য়ে গেছে—হাত দিয়ে দেখিয়ে প্রশ্ন ক'রলো,—কেমন হ'য়েচে,—সুন্দর না ?

—হ্যাঁ, চমৎকার। শীলা চায়ের পেয়ালা মুখের কাছে নিয়ে এলো।

(ক্রমশ)

পরিচালক ও বাংলা নাটক

মণীন্দ্র বসু

রঙ্গালয়ের সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে এ'কথা বহুবার বলা হোয়েছে যে চলচ্চিত্রের, বিশেষতঃ সবাক্ চলচ্চিত্রের, আবির্ভাবই রঙ্গালয়ের বর্ত্তমান দুর্দ্দশার প্রধান কারণ। কিন্তু আমাদের মনে হয়, এ'কথা আংশিক সত্য হ'লেও সম্পূর্ণ সত্য নয়। রাশিয়া, আমেরিকা, ইটালী প্রভৃতি সাগরপারের দেশে চলচ্চিত্রের আবির্ভাব হয়েছিল আমাদের দেশের অনেক আগে, তবুও এ'সব দেশের রঙ্গালয়গুলি এখনও বেশ ভালভাবেই চলছে এবং উন্নতিও করছে। তবে চলচ্চিত্রের আগমনে এবং প্রতিযোগিতায় যে মঞ্চের কিছুটা ক্ষতি হয়েছে, তা অস্বীকার করা যায় না। এর প্রধান কারণ হচ্ছে সিনেমা সস্তা, অর্থাৎ খরচের তুলনায় আনন্দ পাওয়া যায় অনেক বেশী। চলচ্চিত্রের প্রথম যুগে দর্শকরা রঙ্গালয়ের পৃষ্ঠপোষকতাই বেশী কোরতেন, কারণ মঞ্চাভিনয়ে যে সজীবতার আবেদন আছে, চলচ্চিত্রের ভেতর হাজার চেষ্টা করলেও তা' আনা যায় না। কিন্তু এই আবেদন সত্বেও উচ্চশ্রেণীর অভিনয় এবং প্রয়োগনৈপুণ্যের জন্য চলচ্চিত্র জনপ্রিয়তার মাপকাঠিতে রঙ্গমঞ্চকে অনেক পশ্চাতে ফেলে চলেছে।

অভিনয়ের কথা এই প্রবন্ধে বিশেষ কিছু বোলতে চাই না, কারণ এই বিষয় নিয়ে কিছু কিছু আলোচনা সুধীরা করে থাকেন। এখানে নাটকের পরিচালনা সম্বন্ধে দু'একটি কথা বোলতে চাই, কারণ, মনে হয় রঙ্গমঞ্চের উন্নতি সাধন কোরতে হলে প্রথম প্রয়োজন প্রয়োগনৈপুণ্য। আমাদের বাঙ্গলা রঙ্গালয়গুলির বিষয় বোলতে গেলে অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গেই স্বীকার কোরতে হয় যে, দু'একখানির কথা বাদ দিলে, অধিকাংশ নাটকেই দেখা যায় প্রয়োগনৈপুণ্যের বিশেষ অভাব। এই সব নাটকের অভিনয় দেখলে মনে হয় পরিচালকরা হয় বেশী মাথা ঘামান না, আর না হয় তাঁদের মগজে সারবস্তু বিশেষ কিছু নেই। যেখানে সেখানে সঙ্গীতের বা নৃত্যের অবতারণা অথবা বীররসের সৃষ্টি, ঘন ঘন উপদেশমূলক বা দেশাত্মবোধসূচক বক্তৃতাবলী, দর্শকের মনকে আনন্দ দেওয়ার চেয়ে বেশী পীড়িত কোরে তোলে, একথাটা তাঁরা যে কেন উপলব্ধি করেন না, তা বোলতে পারি না। এ'দের নাটক নির্ব্বাচনেরও বিশেষ প্রশংসা করা যায় না।

নাটকের সর্ব্বাঙ্গীন সাফল্যের জন্য দায়ী পরিচালক। তাঁর কর্ত্তব্য শুধু ঘন ঘন

মহড়া দিয়ে অভিনেতাদের তৈয়ারী করা—এতেই শেষ নয়। এ ছাড়াও তাঁর অনেক কর্ত্তব্য আছে। নাটক নির্ব্বাচন ও তার যথাযোগ্য পরিবর্জ্জন, পরিবর্দ্ধন ও পরিশোধন, অভিনেতাদের তৈয়ারী করা; সঙ্গীত পরিচালনা ও নির্ব্বাচনের প্রতি লক্ষ্য রাখা, দৃশ্যপটাদির যথাযথ ব্যবস্থা আলোক নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি সকল বিষয়ই পরিচালকের কর্ত্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। অবশ্য কোন কোন বিষয়ে তিনি বিভাগীয় পরিচালকদের উপর কতকাংশ নির্ভর কোরতে পারেন কিন্তু সব সময়েই তাঁকে মনে রাখতে হবে যে সকল বিভাগের সাফল্য নির্ভর কোরছে তাঁর নিজের প্রয়োগনৈপুণ্যের ওপর। তিনি হচ্ছেন সকল বিভাগের সর্ব্বময় কর্ত্তা। মঞ্চের সকল বিভাগ সম্বন্ধেই তাঁর অল্পবিস্তর জ্ঞান থাকা আবশ্যক, যাতে কোরে তিনি প্রয়োজন মত সংশোধনাদি করে নিতে পারেন।

পরিচালনার কোন বাঁধাধরা নিয়মকানুন নেই, আর তা থাকতেও পারে না, কারণ প্রতিটি নূতন নাটক মঞ্চস্থ করার সময় পরিচালককে সম্মুখীন হতে হয় নূতন নূতন সমস্যার— কারণ প্রত্যেক নাটকের উপকরণ আলাদা আলাদা। সুপরিচালনা নির্ভর করে পরিচালকের তীক্ষ্ণবুদ্ধি, সূক্ষ্ম রসবোধ, বৃহত্তর অনুভূতির উদ্দীপনা এবং অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের উপর। সুপরিচালক যখন তাঁর নির্ব্বাচিত নাটকখানি পড়েন তখন তাঁর মনে নাটকের ভিতরের ঘাত প্রতিঘাত থেকে একটা সূক্ষ্ম অনুভূতি সঞ্চারিত হয়। পরিচালনার সাফল্য এক কথায় নির্ভর করে দর্শকের মনে, তাঁর এই অনুভূতি—যা তিনি পড়তে পড়তে লাভ করেছেন—তা অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে সঞ্চারিত করার সার্থকতায়, আনন্দ, বেদনা, করুণা যাই হোক্। এই মুখ্য উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি দৃশ্য সংস্থাপনা কোরবেন, অভিনেতাদের মহড়া দেওয়াবেন, এবং অন্যান্য কর্ত্তব্যগুলি সম্পাদন কোর্‌বেন। এ'ছাড়াও পরিচালককে অনেক দিকেই নজর রাখতে হয়। এ সম্বন্ধে ও-দেশের:'দু' একজন খ্যাতনামা পরিচালকের মত উদ্ধৃত করে দিচ্ছি—

একজন বলেছেন—"পরিচালনার কোন 'বাঁধা সড়ক' নেই। 'কোন দৃশ্য কি ভাবে সংস্থাপিত হবে', 'কোন্ অভিনেতা কোন সময়ে কি ভাবে আবৃত্তি কোরবেন', 'আলোক কোন সময়ে কি ভাবে নিয়ন্ত্রিত হবে' এ সমস্ত বিষয়ে একান্ত ভাবেই নির্ভর করতে হয় নিজের বিচারবুদ্ধির ওপর (অবশ্য ভুল যদি হয় তবে নিশ্চয়ই তা অভিনয়ে প্রতিবিম্বিত হবে। কল্পনা ও তীক্ষ্ণদৃষ্টিশক্তি পরিচালনার ব্যাপারে অনেক সাহায্য করে। দৃশ্যপট ও সাজসজ্জার খুঁটিনাটির ওপর আমি তেমন লক্ষ্য রাখি না কারণ আমি চাই বরং এদিকে একটু ত্রুটি থাক্, কিন্তু অভিনয় এমন জমাট বাঁধুক যে দর্শকরা যেন এ'সব দোষ লক্ষ্য করবার সময় না পায় (অবশ্য এমন কথা বলছি না যে খুঁটিনাটির প্রতি একেবারেই লক্ষ্য রাখব না)। দৃশ্যপট সংস্থাপককে আমি আমার অনুভূতির কথা বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা করি এবং তাঁকে ধাঁজটা ঠিক

করে দিই। তাঁর কাজ শেষ হলে যদি কোন জায়গায় রদবদল করতে হয় তবে তাঁর সঙ্গে আমি পরামর্শ করি এবং দুজনে মিলে আবশ্যকমত ব্যবস্থা করি।"

"অভিনেতা ও অভিনেত্রী নির্ব্বাচন এক কঠিন সমস্যা। আমি কারুর খ্যাতির তোয়াক্কা রাখি না। আমার বিচার বুদ্ধিতে যে লোককে উপযুক্ত মনে হয় আমি তাকেই নির্ব্বাচিত করি। বহুলোকের মতের বিরুদ্ধে আমি অনেক সময় অনেক অখ্যাত বা স্বল্পখ্যাত অভিনেতা বা অভিনেত্রীকে নায়ক নায়িকা নির্ব্বাচিত করেছি এবং, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, যে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তাঁরা আমাকে হতাশ করেন নি। নির্ব্বাচনের পরে আট দিন আমি এই অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের একটি গোল টেবিলের চার পাশে বসিয়ে সমস্ত বইখানি তাঁদের পড়তে বলি যাতে করে তাঁরা বইয়ের ভাবধারা সম্যক্‌রূপে গ্রহণ করতে পারেন। এই আমার একটি বাঁধাধরা নিয়ম এবং কোন কালেই এর ব্যতিক্রম হয় না যদিও মনে হয় এই পর্ব্ব শেষ হবার পূর্ব্বে বহু অভিনেতাই আমার জীবনান্ত কামনা করেছে। আর একটা আমার এই নিয়ম যে আমি আগে কোন suggestions দিই না। প্রত্যেক অভিনেতা অভিনেত্রী নিজেরা আগে অভিনয়ের মহলা দেন, আমি তার নীরব দর্শক থাকি। পরে যদি কোন অংশ আমার পছন্দ মত না হয়, তবে আমি সেই অভিনেতাকে বিশেষভাবে বুঝিয়ে দিই, কি ভাব তাঁকে প্রকাশ করতে হবে। তখনও যদি তিনি সঠিক ভাব প্রকাশ করতে না পারেন তবেই আমাকে জোর করতে হয় এবং দেখিয়ে দিতে হয়।"

"অভিনয়ের Tempo বা গতি আমি ঠিক করে ফেলি মহলার প্রথম থেকে, কারণ আমার মনে হয় 'tempo is even more a matter of sound than of movement' গলার স্বর, আবৃত্তির ছন্দ ও ভাবের গভীরতা, সুরসংহতি প্রভৃতি মহলার প্রথম দিনেই ঠিক করে নেওয়া যায় এবং তার সঙ্গে নৃত্য ও গীতের সঠিক সমাবেশ করে নেওয়া গেলেই tempo নিয়ন্ত্রিত হয়ে যায় আপনা থেকেই, কারণ এর ভেতর থেকেই অভিনেতৃবর্গ সঠিক অনুপ্রেরণা পেয়ে যান।"

পরিচালনার বিষয়ে এই প্রবন্ধে অত্যন্ত সাধারণ ভাবেই আলোচনা করা হয়েছে। কারণ বিশদভাবে আলোচনা করতে গেলে আলাদা বইই লিখতে হয়। তবে মনে হয় আমাদের রঙ্গমঞ্চের পরিচালকরা যদি একটু শ্রম স্বীকার করেন এবং একটু মস্তিষ্ক চালনা করেন তা'হলে আমাদের রঙ্গালয়গুলিরও সুদিন নিশ্চয়ই ফিরে আসবে।
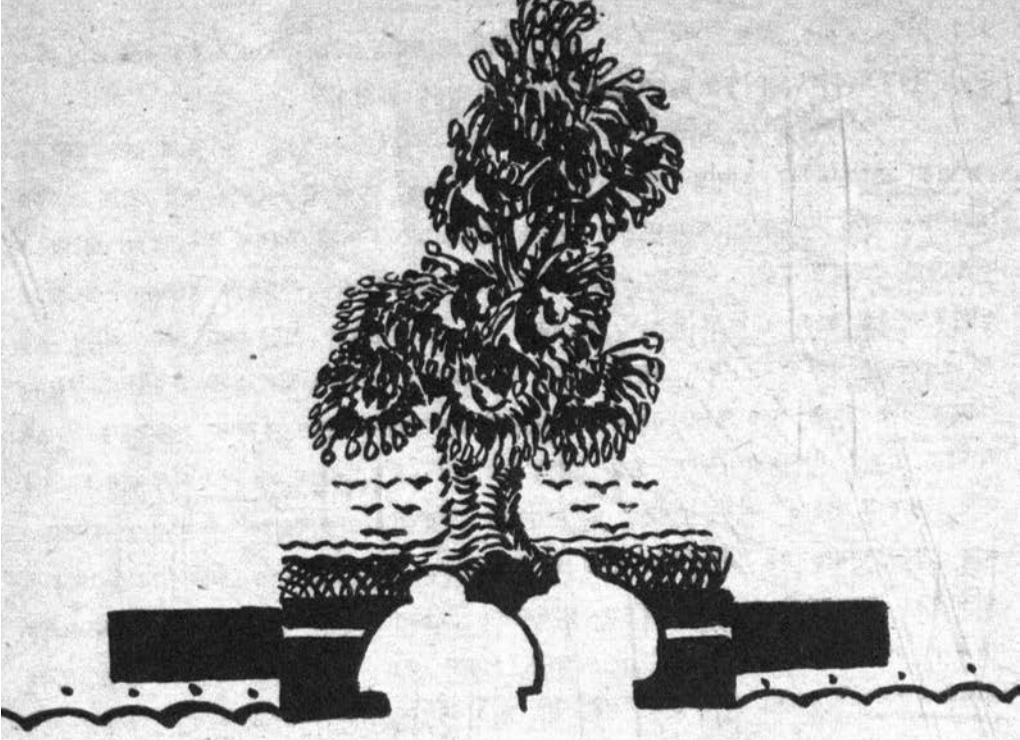
কলা-ভবন

বাংলার বর্ত্তমান চিত্রকলা

বিমলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

কলিকাতার বাৎসরিক চিত্রপ্রদর্শনীগুলিতে প্রদর্শিত ছবির সংখ্যা বাঙালীর চিত্র-কলার প্রতি গভীর অনুরাগের একটি বড় নিদর্শন। বাঙালী চিত্রকর বৎসরে শত শত ছবি আঁকেন, একথা ভাবিতেও আনন্দ হয়। কিন্তু কেবল সংখ্যা দেখিয়া আনন্দিত হইবার কিছু নাই। ছবির সংখ্যাই বড় কথা নয়, ছবি কোন্ শ্রেণীর এবং তাহা সত্যই কোন গভীর ভাব প্রকাশ করিল কিনা তাহাই প্রথমে বিচার্য্য। যে কোন চিত্র প্রদর্শনীতে গেলেই দর্শকের মনে এরূপ প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক। আমাদের চিত্র প্রদর্শনীগুলিতে যাঁহারা যান, তাঁহাদের সকলের না হইলেও অন্তত কয়েক জনের মনে বাঙালী চিত্রকরদের ছবি সম্বন্ধে এরূপ প্রশ্ন জাগিয়াছে, ইহার আভাস আমরা পাইয়াছি।

চিত্রপ্রদর্শনী হইতে ফিরিয়া আসা পর যদি কোন ছবির ছাপ মনে না থাকে তাহা হইলে বলিতে হইবে দর্শকের রসোপলব্ধির ক্ষমতা নাই, নতুবা প্রদর্শনীতে উল্লেখযোগ্য কোন ছবি প্রদর্শিত হয় নাই। অ্যাকাডেমি অফ্ ফাইন আর্ট্স অনুষ্ঠিত বিরাট প্রদর্শনী হইতে ফিরিয়া আসিয়াও অনেককে বলিতে শুনিয়াছি সেখানকার ছবিগুলির মধ্যে দুই চারি খানি মোটামুটি ভাল, বাকি সব কিছু নয়। একথা সামান্য অথচ সাধারণ কয়জন দর্শক বলিলে না হয় জিনিষটা উড়াইয়া দেওয়া যাইত, কিন্তু ইহাই বেশীর ভাগ লোকের মত।

আমাদের মনে আজ যে প্রশ্নটি খুব বড় হইয়া দেখা দিয়াছে তাহা এই — বর্ত্তমানে আমাদের চিত্রকরেরা কোন সুনির্দ্দিষ্ট পথে চলিতেছেন কিনা এবং সত্যই তাঁহারা চিত্র-কলার দিক হইতে জাতীয় জীবন সমৃদ্ধশালী করিয়া তুলিতেছেন কিনা?

প্রশ্নটি সহজ হইলেও উত্তর খুব সহজ নয়। কারণ এ প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে আমাদের চিত্রকলা নানা ভাবে বিচার করা প্রয়োজন। আমরা সূক্ষ্ম বিচারে প্রবৃত্ত না হইয়া খুব সাধারণ ভাবে আমাদের চিত্রকলা সম্বন্ধে মোটামুটি কয়েকটি বিষয়ের আলোচনা করিব। এখানে বলিয়া রাখা ভাল এই ব্যাপারে যে-দৃষ্টি আমাদের সহায় তাহা সাধারণ দর্শকের দৃষ্টি বিশেষজ্ঞের দৃষ্টি নয়।

আমাদের আলোচ্য বিষয় তিনটি,—বিষয়বস্তু, অঙ্কনরীতি ও রঙের ব্যবহার। এই তিনটি বিষয়ের আলোচনা হইতে আমরা আমাদের বর্ত্তমান চিত্রকলা সম্বন্ধে একটা ধারনা করিতে পারিব। প্রথমত বিষয়বস্তুর কথাই ধরা যাক্। সাধারণত পৌরাণিক কাহিনী, ইতিহাস, প্রাকৃতিক দৃশ্য, দৈনন্দিন জীবন এবং কল্পনার খেলা হইতে ছবির বিষয়বস্তু গ্রহণ করা হয়। আমাদের দেশ রামায়ণ মহাভারত ও রূপকথার দেশ, এখানে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের অন্ত নাই, প্রাচীন দেশ হিসাবে ইহার ইতিহাস বৈচিত্র্যবহুল; তাহা ছাড়া এত বড় জাতির দৈনন্দিন জীবনেও কম বৈচিত্র্য নাই, চিত্রকরদের কল্পনার রাজ্যের কথা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম। এ অবস্থায় বিষয় বস্তুর দিক হইতে আমাদের চিত্রকরদের কোন অভাব থাকিতে পারে না।

বাঙলা দেশে চিত্রকলার ইতিহাসে নূতন যুগ প্রবর্ত্তন করেন অবনীন্দ্রনাথ; তিনি এখনও জীবিত এবং বাঙলা দেশ তথা ভারতবর্ষে এ-যুগের নাম-করা চিত্রকরদের অনেকেই প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ ভাবে তাঁহার ছাত্র। তিনি যে-আন্দোলনের সূচনা করেন, তাহা প্রধানত ছিল ভারতীয় চিত্রকলার প্রাচীন পদ্ধতিকে নূতন ভাবে জাগাইয়া তুলিবার আন্দোলন। তাই অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁহার কৃতী ছাত্রদের অধিকাংশ ছবির বিষয়বস্তুই ছিল পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক। এরূপ বিষয়বস্তু নির্ব্বাচনের পিছনে অবনীন্দ্রনাথের বিশেষ

একটি উদ্দেশ্য ছিল ; কিন্তু পরে দেখা গেল এ উদ্দেশ্য অনেক চিত্রকরই উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। এ দিকে সকলেই মনে করিলেন যে ছবির বিষয়বস্তু সংগ্রহ করিতে হইবে পৌরাণিক কাহিনী বা ইতিহাস হইতে। ইহার ফলে একই বিষয়বস্তু লইয়া বহু চিত্রকর ছবি আঁকিতে থাকেন। ইহাতেও আপত্তি ছিল না, যদি চিত্রকরেরা এক জাতীয় বিষয়বস্তু সত্ত্বেও অন্যদিক দিয়া নিজ নিজ মৌলিকতার পরিচয় দিতে পারিতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশত কোন দিক দিয়াই তাঁহারা মৌলিকতার পরিচয় দিতে পারেন নাই। ইউরোপে বাইবেলের কাহিনী লইয়া বহু শিল্পী ছবি আঁকিয়াছেন, এক জাতীয় বিষয়বস্তু হইলেও প্রত্যেক শিল্পীর স্বাতন্ত্র্য এবং তাঁহাদের ছবির সজীবতা দর্শককে বিস্ময়ে অভিভূত করে। একথা ভাবিতেও দুঃখ হয় যে আমাদের দেশে এ যুগের চিত্রকলার বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যহীনতা চিত্রকলার উৎকর্ষের একটি প্রধান অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

এখানে আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। উপরোক্ত বিষয়বস্তু নির্ব্বাচন করিতে যাইয়া আমাদের চিত্রকরেরা জীবনের সহিত সকল যোগ হারাইয়া ফেলিয়াছেন। ছবি আঁকিবার বিষয়বস্তু আমাদের প্রতিদিনের জীবনে অজস্র রহিয়াছে, প্রয়োজন কেবল সেগুলি বাছিয়া লওয়া। কিন্তু আমাদের চিত্রকরেরা জীবন প্রবাহ হইতে নিজেকে এত দূরে রাখিয়াছেন যে সেখানে প্রতিদিনের জীবনের কোন কিছুই পৌঁছায় না। যে-চিত্রকলা বা যে-সাহিত্য জীবনের সহিত যোগ হারাইয়া ফেলে সে চিত্রকলা বা সে সাহিত্য স্রোতহীন জলের মত অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠে। অবশ্য এক দল চিত্রকর বৈশিষ্ট্য অর্জ্জনের জন্য নূতন ধরনের বিষয়বস্তু নির্ব্বাচন করিতেছেন। বিষয়বস্তুর অন্বেষণে তাঁহারা পুরাণ, রূপকথা, ইতিহাস ছাড়িয়া একেবারে হাটে বাজারে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। ইঁহারা মৌলিকতার নামে যে-বিকৃত রুচির পরিচয় দিতেছেন তাহা ভাবিলে কষ্ট হয়। মানুষের দেহের সৌন্দর্য্য চিরকাল আদৃত হইয়াছে এবং হইবেও, কিন্তু তাই বলিয়া দেহের বিশেষ একটি সৌন্দর্য্যের প্রতি অসুস্থ-আকর্ষণকে আর যাহাই হউক উচ্চাঙ্গের আর্ট বলা চলে না। ইঁহাদের হাতে ধীবর গৃহিণী সুন্দরী হইয়া উঠিয়াছে সত্য কিন্তু এক শ্রেণীর প্রাণহীন রমনীকে নানা বেশে নানা ভঙ্গিতে দেখিতে নিশ্চয়ই সুস্থ সবল লোকের ভাল লাগে না। এখানেও দেখা যায় জীবনের সহিত চিত্রকরদের শোচনীয় দূরত্ব। আমাদের চিত্রপ্রদর্শনীগুলিতে গেলেই ব্যাপারটি সহজে নজরে পড়ে। তবে এ মন্তব্য আমাদের সকল চিত্রকর সম্বন্ধে খাটে না। দুই এক জন আছেন যাঁহারা আপন স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিতে সক্ষম হইয়াছেন। কিন্তু তাঁদের কথা আলাদা।

আমাদের অধিকাংশ চিত্রকরের অঙ্কনরীতির দিকে চাহিলে হতাশ না হইয়া পারা

প্রসুপ্ত জাগরণ —গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

'মেঘদূত' হইতে —অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

যায় না। একটি রীতি আমাদের দেশে প্রচলিত হইয়াছে, সেটি তথাকথিত ভারতীয় রীতি। ইহা সকলের সুপরিচিত, কাজেই বুঝাইয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। সাবানের বিজ্ঞাপন হইতে আরম্ভ করিয়া মহাপ্রভুর গৃহত্যাগ পর্য্যন্ত সবই ভারতীয় রীতি অনুসারে অঙ্কিত। বস্তুত এই রীতিটি আজ কাল এতই সস্তা হইয়া পড়িয়াছে যে আমরা ভারতীয় রীতি বলিতে হাস্যরসাত্মক কিছু মনে করিতে আরম্ভ করিয়াছি। অথচ প্রকৃত ভারতীয় রীতি হাসির জিনিষ নয়, ইহা শিল্পীর লোকোত্তর প্রতিভা এবং সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্যানুভূতির পরিচায়ক। কিন্তু বর্ত্তমানে প্রাচীন ভারতীয় রীতিতে ছবি আঁকা শিল্পীর অক্ষমতা ও অজ্ঞতা ঢাকিবার উপায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রাচীন ভারতে যে-রীতি প্রচলিত ছিল তাহা অননুকরণীয়; সেই সকল যুগের নামহীন শিল্পী-গণ তাঁহাদের অন্তরের ভাব ফুটাইয়া তুলিবার জন্যই বিশেষ করিয়া এই রীতিটির উদ্ভাবন করিয়া ছিলেন। ইহার পিছনে তাঁহাদের বিরাট সাধনা ছিল। ইহা বুঝিতে হইলেও সাধনার প্রয়োজন। তখনকার দিনে যে-রীতি প্রচলিত ছিল এখন তাহা জোর করিয়া চালাইলে চলিবে কেন। যুগে যুগে অঙ্কন রীতির পরিবর্ত্তন হয়, এই পরিবর্ত্তনই চিত্র কলায় নূতনত্ব সৃষ্টি করে। এ যুগে কোন্ রীতিতে ছবি আঁকা দরকার তাহা কেহই বলিতে পারে না। শিল্পী নিজের রীতি নিজে উদ্ভাবন করেন। কিন্তু শিল্পীর মন যেখানে অনুকরণপ্রিয় সেখানে নূতন রীতি তিনি উদ্ভাবন করিবেন কেমন করিয়া? এই অনুকরণই আজ আমাদের চিত্রকলাকে পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছে।

বিশেষ একটি রীতিতে ছবি আঁকা খারাপ তাহা আমরা মনে করি না। চিত্রকরের ব্যক্তিত্ব থাকিলে তিনি যে কোন রীতিকে আপনার করিয়া লইতে পারেন। উদাহরণ স্বরূপ গগনেন্দ্রনাথের কথা বলা যাইতে পারে। তিনি বহু রীতি লইয়া পরীক্ষা করিয়াছেন, কিন্তু তাই বলিয়া তিনি বিশেষ কোন রীতির অন্ধ অনুকরণ করিয়াছেন একথা বলা চলেনা। বরং বিভিন্ন রীতির প্রভাব সত্ত্বেও তিনি নিজস্ব একটি রীতির উদ্ভাবন করিয়াছেন। গগনেন্দ্রনাথের কথা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম; নন্দলাল বসুর ছবিতে বিভিন্ন রীতির ছাপ থাকা সত্ত্বেও শিল্পীর মৌলিকতা দর্শককে মুগ্ধ না করিয়া পারে না। কিন্তু অন্ধ অনুকরণের ফলে আমাদের দেশের বেশীর ভাগ চিত্রকরের মৌলিকতা চাপা পড়িয়া গিয়াছে।

একদল চিত্রকর বিদেশী রীতিতে ছবি আঁকিবার চেষ্টা করিতেছেন। বিদেশী চিত্র-কলা হইতেও আমাদের শিখিবার বহু জিনিষ আছে। কিন্তু এখানেও সেই অনুকরণের কথাই আসিয়া পড়ে। বিদেশী ছবি হইতে যতটুকু গ্রহণ করিলে আমাদের ছবির স্বাতন্ত্র্য নষ্ট না হয় অথচ বৈচিত্র্য বাড়ে ততটুকুই শিল্পী গ্রহণ করেন। কিন্তু যে সামান্য কয়জন চিত্রকর তথাকথিত ভারতীয় রীতি বর্জ্জন করিয়া ইউরোপীয় রীতি অনুযায়ী ছবি আঁকিতেছেন,

তাঁহারা নূতনত্বের মোহে সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছেন। ইউরোপের চিত্রকলার এক একটি আন্দোলনের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়, এ সকল আন্দোলন নিছক নূতনত্ব সৃষ্টির জন্য অনুষ্ঠিত হয়না, তাহাদের পিছনে একটি সুনির্দ্দিষ্ট মনোভাব ও গভীর আন্তরিকতা থাকে, সেই জন্যই আন্দোলনগুলি সার্থক হইয়া উঠে। আমাদের দেশে সত্যই যদি চিত্র-কলার নব আন্দোলন সৃষ্টি করিতে হয় তাহা হইলে চিত্রকরদের স্থির করিতে হইবে তাঁহারা কি চান এবং কেন চান। যেখানে লক্ষ্য অনির্দ্দিষ্ট সেখানে উপলক্ষ্যের মধ্যে গলদ থাকাই স্বাভাবিক।

এইবার রঙের ব্যবহারে আসা যাক্। এদেশে অত্যুজ্জ্বল রঙের ব্যবহার খুব কম, আমাদের জাতীয় চিত্রকলায় ইহা একটি বৈশিষ্ট্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমাদের বিখ্যাত ছবিগুলির রঙে গোধুলির ধূসরতার মত একটি সুস্নিগ্ধ সুনিবিড় ভাব আছে; কোন রং উগ্র নয় অথচ প্রত্যেকটি রঙের নিজস্ব একটি 'টোন' রহিয়াছে, এবং বিভিন্ন রঙের সংমিশ্রণে একটি অপরূপ মাধুর্য্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমান চিত্রকরদের অনেকেই রঙের এই স্নিগ্ধতা রক্ষা করিতে যাইয়া রঙের সকল মাধুর্য্য নষ্ট করিয়াছেন। তাঁহাদের ছবিতে রংগুলির নিজ নিজ 'টোন' বুঝা যায়না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রংগুলি নির্জ্জীব ও নীরস বলিয়া মনে হয়। সুদক্ষ চিত্রকরে ছবিতে প্রথমেই তাঁহার রঙের ব্যবহার নজরে পড়ে। কোন্ জায়গায় কোন্ রংটি মানায় বা কোন্ কোন্ রঙের সংমিশ্রণে কোন্ ভাবটি ভাল করিয়া ফুটিয়া উঠে ইহা আয়ত্ত করা সময় ও পরিশ্রম সাপেক্ষ। এদিকে আমাদের চিত্রকরেরা বিশেষ দক্ষতা অর্জ্জন করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। রঙের অপূর্ব্ব ব্যবহারের পরিচয় পাওয়া যায় ইম্প্রেশনিষ্টদের ছবিতে। কিন্তু তাহার পিছনে ইম্প্রেশনিষ্ট সম্প্রাদায়ের যে-সাধনা ছিল তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। সে সাধনার সন্ধান কয়জন চিত্রকর রাখেন?

খোলা জায়গায় ছবি না আঁকিলে রং সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা জন্মিতে পারেনা। আমাদের অধিকাংশ চিত্রকর আগাগোড়া ঘরে বসিয়া ছবি আঁকেন, ফলে বাহিরে প্রতি মুহূর্ত্তে নানা রঙের যে বিচিত্র খেলা চলে, তাহার সহিত পরিচিত হইতে পারেন না। প্রকৃতির রং যাঁহার অনুভূতি স্পর্শ করিতে পারে নাই তিনি কি করিয়া কৃত্রিম রঙের সাহায্যে মনের গভীরতম ভাব প্রকাশ করিবেন! এই জন্যই বোধ হয় আমাদের চিত্রকলায় প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবির সংখ্যা কম, এবং যে কয়খানি আছে তাহাদের বেশির ভাগই স্পন্দনহীন বলিয়া মনে হয়। ছবির রং দর্শককে অভিভূত করিতে পারে এমন ছবি এদেশে কয়খানি দেখা যায়? প্রমোদ চট্টোপাধ্যায়ের আঁকা মানস সরোবরের ছবি যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারা জানেন প্রকৃতির রং শিল্পীর অনুভূতির ভিতর দিয়া কি ভাবে ছবিতে প্রতিফলিত হয়।

আর একটি জিনিষ অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে একখানি ছবি আঁকিতে যথেষ্ট সময় লাগে। কিন্তু আমাদের প্রদর্শনীর ছবিগুলি দেখিলে মনে হয়না চিত্রকরেরা তাঁহাদের ছবির জন্য উপযুক্ত সময় দিয়াছেন। প্রায় ছবিই যেন কোন মতে শেষ করা হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। একখানি ছবি আঁকিতে হইলে বহু খসড়া করিতে হয়। এমন শিল্পী খুব কমই আছেন যিনি তুলি ধরিবার সঙ্গে সঙ্গে একখানি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ছবি আঁকিতে পারেন। চিত্রকরের পক্ষে ড্রইং এবং খসড়া করা বিশেষ প্রয়োজন। লিওনার্দো দ' ভিঞ্চি রেমব্রাণ্ট্ প্রমুখ শিল্পাচার্য্যদের অসংখ্য ড্রইংএর কথা কে না জানে! তাঁহাদের একখানি ছবির পিছনে কত খসড়া থাকিত তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। কিন্তু আমাদেব অধিকাংশ চিত্রকরেরা ড্রইং-এর সাহায্যে হাতের জড়তা দূর করিয়া সকল রকম ভাব প্রকাশ করিবার ক্ষমতা অর্জ্জন করাটা প্রয়োজন বলিয়া বোধ করেন না। তাই তাঁহাদের ছবিতে যেখানে সেখানে ড্রইং-এর দোষ ত্রুটি অতি সহজেই ধরা পড়ে। ড্রইং ভাল করিতে পারিলে প্রতিটি রেখা জীবন্ত হইয়া উঠে, এই কথাই তাঁহারা ভুলিতে বসিয়াছেন।

আমাদের বর্ত্তমান চিত্রকলা সম্বন্ধে সাধারণ দর্শক হিসাবে আমরা যে-আলোচনা করিলাম তাহা যথেষ্ট নয়। এসম্বন্ধে বহু কথা বলিবার আছে। বস্তুত আমরা কেবল প্রশ্নটিই উত্থাপন করিয়াছি; এখন নানা দিক হইতে এ-প্রশ্নটি দেখিতে হইবে। আমাদের চিত্রকলা সম্বন্ধে যাঁহারা ভাবেন ও আলোচনা করেন আজ তাঁহারা সজাগ হইবেন, আমরা তাহাই আশা করি। কিন্তু সর্ব্বোপরি চিত্রকলার সেবায় যাঁহারা আত্মনিয়োগ করিয়াছেন তাঁহাদের প্রচেষ্টার উপর আমাদের চিত্রকলার ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে, এই কথাটিই আমরা তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতে চাই।

বাংলা চিত্রের কেন এ দুর্দ্দশা ?

রবীন্দ্রনাথ ঘোষ

বাঙ্গালীর নিজের হাতে গড়া সিনেমা কেন ডুবতে বসেছে সে বিষয়ে আলোচনা সুরু করেছেন সাগরময়বাবু। আত্ম-বিশ্লেষণ না করলে আত্মোন্নতি সম্ভব নয়। রোগের বীজ কোন্‌খানে যদি জানা যায় তবেই রোগ প্রতিরোধ করা যায়। কোন্ বিষ সংক্রামিত হওয়ার ফলে আজ বাংলা চিত্রের এ দুর্দ্দশা তা জান্‌লে ও স্বীকার কর্‌লে তবেই এই মরণোন্মুখ শিল্পকে সঞ্জীবিত করে তুল্‌তে পারা যাবে। বাঙ্গালী সিনেমা দেখতে চায় না, কি বাংলার সিনেমায় পয়সা দেওয়ার ক্ষমতা নেই-এ কথা স্বীকার করা যায় না। বাংলার প্রাণশক্তি হল মধ্যবিত্ত শ্রেণী ; এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীই বাংলার শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি যা কিছু সব গড়ে তুলেছে। সিনেমার দর্শকও এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী। আর অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বাংলাতেই যখন মধ্যবিত্ত-শ্রেণী বেশী তখন নিঃসন্দেহে বলা যায় যে বাংলার সিনেমা-দর্শক সংখ্যা আর সব প্রদেশের চেয়ে বেশী, অন্ততঃ কম নয়। হিন্দী ছাড়া কোন প্রাদেশিক ভাষায় তোলা ছবির বাজার বাংলারই বেশী। তা নইলে বোম্বাই প্রদেশ বাংলা ছবি তোলায় এত উৎসাহ দেখাবেই বা কেন ? সুতরাং দর্শক অভাবে যে বাংলা ছবি ডুবতে বসেছে তা নয় ; কারণ খুঁজতে হবে অন্যত্র।

অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখি যে জাতিগত যে-সব দোষ আমাদের আছে সে-সবের জন্যই এত বড় শিল্পের উন্নতির পথে বিরাট বাধা এসেছে। আমরা পরশ্রীকাতর। চোখের সাম্‌নে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠান বড় হ'য়ে উঠছে এ আমরা সহ্য করতে পারি না। কিসে তার ক্ষতি হয়, কিসে তার উচ্ছেদ হয় কি করে তাকে দাবিয়ে দেওয়া যায় এই চিন্তা তখন পেয়ে বসে! অভিনেতা অভিনেত্রীর যে কত অভাব তা সবাই জানি। অনেক ঢুঁড়ে হয়ত চলনসই অভিনেত্রী জোগাড় হল, তাকে তালিম দিয়ে ছবি উঠল এবং দর্শকেও সেই অভিনেত্রীকে সানন্দে গ্রহণ করলে। আর যায় কোথা! সেই অভিনেত্রী কোন দলে যোগ দেবে তা নিয়ে পড়ে গেল হেঁচড়া-হেঁচড়ি, ছেঁড়া-ছেড়ি ; আইন-আদালত পর্য্যন্ত বাদ গেল না। ফলে যে প্রতিষ্ঠান হয় ত জেগে উঠত, তার হ'ল অকাল মৃত্যু। চেনা-অচেনা নট-নটীকে এইভাবে জড়ো কর্‌লে সেই প্রতিষ্ঠানকে তার ফল ভোগ করতে হয়। আমাদের

বৃহত্তম স্টুডিওগুলিও তিন-চার খানার বেশী ছবি একসঙ্গে তোলার ব্যবস্থা করতে পারেন না। সুতরাং অনেকগুলি তারকা যদি একসঙ্গে একটী চিত্রপ্রতিষ্ঠানে চুক্তিবদ্ধ থাকে তাহ'লে কয়েকজনকে বসিয়ে খাওয়াতেই হয়; ফলে স্টুডিওর চল্‌তি মাসিক খরচা যায় বেড়ে। এ অতি "আন্ ইকনমিক ম্যানেজমেণ্ট।"

আমাদের স্টুডিওগুলির খরচা আর একভাবেও বাড়ে। আমাদের মনে থাকে না যে ব্যবসায়ে সেন্টিমেণ্টের স্থান নেই। বন্ধুবাৎসল্য, কি আত্মীয়প্রীতির দরুণ এমন সব লোককে আমরা অনেক ক্ষেত্রে স্টুডিওতে স্থান দিই যে, তাঁদের পুষতে গিয়ে যে টাকাটা বেরিয়ে যায় তা পুরাপুরি খরচাই থেকে যায়। প্রীতি, বাৎসল্য প্রভৃতি সেন্টিমেণ্টের সুবিধা নিয়ে কোথাও কোথাও প্রথম শ্রেণীর লোকের বদলে দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীর লোকই আধিপত্য করে। দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীর লোককে সুযোগ দিয়ে 'এফিসিয়েন্ট্' করে নিতে গিয়ে যে টাকাটা তাদের পিছনে খরচা করতে হয় তার ফলে প্রতিষ্ঠানটীর ঋণের বোঝা যায় বেড়ে।

প্রযোজকদের (producer) নিয়ন্ত্রণের অভাবেও ছবি তোলার খরচা যায় বেড়ে। গল্পের কাঠামো অনুমোদিত হলেই পরিচালক লেগে যান ছবি তুল্‌তে। একটা ছবি শেষ করতে যে সময় লাগা উচিত সে সময়ের মধ্যে ছবি শেষ হয় না। যে ছবি আটমাসে শেষ হবে বলে কর্ত্তাদের জানান হয়, তা শেষ হয় আঠারো মাসে। দু-পাতা সিনারিও লেখা হবার সঙ্গে সঙ্গে যদি চিত্রগ্রহণ সুরু হয়, তা হ'লে এ না হ'য়েই পারে না। এক ইঞ্চি ফিল্‌ম তোলার পূর্ব্বে যদি সব "পেপার ওয়ার্ক" শেষ করা থাকে, কতদিনে ছবি শেষ হবে নির্দ্দিষ্ট থাকে এবং ঐ নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ছবি শেষ করতে কর্ত্তারা বাধ্য করেন, তবে স্টুডিওকে অযথা ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয় না। একটা ছবি শেষ হতে যত দেরী হবে, ছবির তৈরী খরচাই যে তাতে শুধু বাড়বে তা নয়, স্টুডিও-র all round expensesই যাবে বেড়ে।

মালিকদের দৃঢ়তার অভাবেও স্টুডিওকে ক্ষতিগ্রস্থ হতে হয়। ডিরেক্টরদের সংযত করার ক্ষমতা চিত্রশিল্পের মালিকদের নেই। ডিরেক্টরদের একগুঁয়েমীর জন্য বার বার লোকসান সহ্য করেও তাঁরা মুখ বুজে থাকেন। ডিরেক্টার একাই গল্প লিখ্‌বেন, সিনারিও লিখবেন আবার ছবির পরিচালনাও করবেন। সঙ্গে সঙ্গে হিরো সাজাও যেন তাঁদের রীতি বলে মনে হচ্ছে।

বহুমুখী প্রতিভার এমন নিত্য বিকাশ আমাদের গা সহা হল বলে। সাদা কথায় এর নাম 'অর্থনৈতিক আত্মহত্যা'।—বাংলার সিনেমা জগতে এই যে স্বেচ্ছাচার চলেছে একে সংযত করবে কে? সমালোচকরা যতই তীব্র সমালোচনা করুক না কেন, এরা নির্বিকার;

ছবির পর ছবি ডুবতে দেখেও এঁদের চৈতন্য হয় না। সুতরাং মালিকেরা যদি কঠোর হাতে এদের সংযত না করেন তা হলে বাংলা সিনেমা বাঁচবে কি করে? অধিকন্তু সিনেমায় যাঁরা প্রবেশাধিকার পেয়েছেন তাঁরা এক-একটা গ্রুপ করে বসে আছেন, বাইরের কারো সে 'ক্লি'কের মধ্যে মাথা গলানর উপায় নেই। তা নইলে ভাল গল্প পাওয়া যায় না কেন? বাংলা সাহিত্য এখনো গল্প সম্পদে ভারতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; এই বাঙ্গালী লেখকদেরই গল্প নিয়ে বোম্বাই প্রদেশের ধন ভাণ্ডার ভরে উঠছে, অথচ বাংলা চিত্রের জন্য গল্প পাওয়া যায় না··· কে একথা বিশ্বাস করবে? মালিকরা, যদি এই 'ক্লিক' ভাঙ্গতে না পারেন, তাহলে বাংলা চিত্রের ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল নয়।

বাঙ্গালী ব্যবসায়ী নয় এবং বাঙ্গালীর প্রাণ অতি ক্ষুদ্র। একটা গল্প শুনেছিলুম। ছেলে বিলেত থেকে condensed milk তৈরী করা শিখে এসে ফ্যাক্টরী খুলে বসলো। বাপ ছেলেকে দিলেন হাজার তিরিশ টাকা; সেই টাকায় তৈরী হল ছানার মণ্ড, condensed milk নয়। কাজেই আবার হাত পাততে হল; অনুরোধ আবেদন এড়াতে না পেরে বাপ আবার দিলেন কিছু টাকা। এবার তৈরী হল সত্যই condensed milk, কিন্তু পরীক্ষাতে দ্বিতীয় দফার টাকাও গেল। ব্যবসা এবার সত্যই দাঁড়াত কিন্তু বাপের টাকার থলির মুখ আর খুল্‌ল না। আমাদের ভাবী শিল্প ধুরন্দরকে যন্ত্র পাতি বেচে দিয়ে বেরুতে হল চাকরীর খোঁজে।

পরীক্ষামূলক কোন ব্যবসায়ে নামতে গেলে যে গোড়ায় মুক্ত হস্তে টাকা ঢাল্‌তে হয় সে শিক্ষা ও কলিজার জোর আমাদের নেই, তা চাকরীগত প্রাণ বাঙ্গালীর অভিজ্ঞতার বাইরে। তাই, ফল পাবার পুর্ব্বেই কিছু টাকা বেরিয়ে যেতে দেখলে আমরা টাকার থলির মুখ মাঝপথেই দি এঁটে······ফলে সব টাকাটাই পুরাপুরি লোকসান হয়েই দাঁড়ায়। সব বাঙ্গালী শিল্পের ইতিহাসই এই। বাঙ্গালী ক্যাপিটালিস্টকে ভুঁইফোড় পরিচালকদের কেউ কেউ ঠকিয়েছেন হয় ত······জোর করে বলি কেমন করে তাঁরা যে ঠক্‌বার জন্যই উন্মুখ হয়েই বসেছিলেন না। তবে অনেক সময়ে পরিচালকরা বাধ্য হয়েই তৈরী খরচার একটা মনগড়া হিসাব দিয়ে পুঁজিপতিকে ব্যবসায়ে নামিয়েছেন, কেন না, তাঁরা অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছেন যে গোড়াতেই একটা বিরাট খরচার হিসাব দাখিল কর্‌লে আর বাঙ্গালী ক্যাপিটালিস্ট পাওয়া যায় না। ব্যবসায়ে নেমে পড়ে বাঙ্গালী ক্যাপিট্যালিস্ট যখন দেখেন যে খরচার বহর দিন দিন বেড়েই চলেছে, তখন খরচা কমাবার জন্য এমন্ সব আব্দার করেন যার ফলে শেষ পর্য্যন্ত যে ছবি তৈরী হয় তাকে সিনেমা ছাড়া আর-যা-কিছু বলা যায়। ক্ষুদ্র প্রাণ বাঙ্গালী ক্যাপিটালিস্ট খরচার হিসাব কমাতে গিয়ে সব টাকাটাই জলে দেন।

অবাঙ্গালী ক্যাপিটালিস্ট শুধু ক্যাপিটালিস্ট নয়, ব্যবসায়ীও। তিরিশ হাজার টাকা খরচা হবার হিসাব যখন পান তখন তিনি ষাট হাজার টাকা খরচ করবার হিসাব করেই ব্যবসায়ে নামেন; তাই শেষ পর্য্যন্ত তাঁর টাকা তাঁর কাছেই ফিরে আসে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে বাঙ্গালী ক্যাপিটালিস্টের কাছে বিশেষ সাহায্য পাওয়া যায় না। বাঙ্গালী স্টুডিওগুলিরও টাকার জোর নেই। কাজেই যেই টাকায় টান ধরে, মালিকরা অমনি হাত-চিঠা কাটেন এবং তার জন্য দিতে হয় চড়া হারে সুদ। কাজেই ছবির তৈরী খরচা যায় বেড়ে। বাঙ্গালীর বীমা কোম্পানী আছে, বাঙ্গালীর ব্যাঙ্ক আছে, কিন্তু এমন্ কোন বাঙ্গালী আর্থিক প্রতিষ্ঠান নেই যা-নাকি চিত্রশিল্পে টাকা জোগায়। যতদিন না এরূপ একটী আর্থিক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে ততদিন বাঙ্গালীর ফিল্ম্ শিল্পের মাথা তুলে দাঁড়ান এক রকম অসম্ভব। যৌথ-কারবার যখন বাঙ্গালীর ধাতে সয় না, তখন বাঙ্গালীর চিত্র শিল্পকে বাঁচাতে হলে এই রকম একটা আর্থিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুল্‌তে হবে।

বাংলা সিনেমার দুর্দ্দশার জন্য আমরাও—সিনেমা সমালোচকেরাও কম দায়ী নয়: বাঙ্গালীর সিনেমাকে কোণঠাসা করার একটা চেস্টা চলেছে, তাই একটু দরদ দিয়ে সমালোচনা করা আমাদের কর্ত্তব্য। ত্রুটি-বিচ্যুতির প্রতি চোখ বুজে থাক্‌তে বল্‌ছিনা, তবে সে আলোচনায় যেন আক্রোশ বা হিংসার ভাব না থাকে……কোথায় ভুল হয়েছে, কেন ভুল হয়েছে, কি হ'লে ভাল হ'ত, যুক্তি দিয়ে, সহানুভূতি দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার। একটা উদাহরণ দিয়ে বলি। "রজত-জয়ন্তী"। আমেরিকার ফিল্ম্ শিল্পে Libelled Lady, Theodora Goes Wild প্রভৃতি ছবির যে স্থান, বাংলা সিনেমায় "রজত-জয়ন্তী"রও সেই স্থান, অন্ততঃ আমার মতে। ক'জন ছবিটাকে সে ভাবে গ্রহণ করেছি? উপরোক্ত ছবি জাতীয় American comedy film দেখে প্রশংসায় আমরা পঞ্চমুখ হই, আর 'রজত-জয়ন্তী'র কথা লিখতে আমাদের কলম থেমে যায় কেন? হয়ত 'রজত-জয়ন্তী' ছবির অনেক দোষ আছে, কিন্তু যে জাতীয় American comedy দেখে আমরা উল্লসিত হ'য়ে উঠি, তার মধ্যে কত ত্রুটি বিচ্যুতি আছে তা ঠিক আমাদের নজরে পড়ে? আমাদের দুঃখের জীবনে পুরা দুই ঘণ্টা ধরে একটানা হাসার সামাজিক মূল্য কতখানি তাকি আমরা ভেবে দেখেছি? অনিচ্ছাসত্ত্বেও দুই ঘণ্টা ধরে হেসে পরমায়ু বাড়িয়ে নিয়ে চিত্রগৃহের বাইরে এসে "নেহাৎ ছ্যাবলামী!" বল্‌তে আমাদের একটুও বাধে না। এত বড় একটা ব্যঙ্গ চিত্র দেখলুম, তাও আবার দার্শনিকের morbid মন নিয়ে। এই বাঙ্গালী মন। কাজেই বড়ুয়া "শাপমুক্তি" তুলবেন না ত কি তুল্‌বেন? আর বড়ুয়াকে অনুসরণ করে তোলা হ'ল "পথভুলে"……তাই পেল সমালোচকের প্রশংসা, দর্শকের পয়সা! আমরা কি পারতুম না লোককে বুঝিয়ে দিতে "রজত-জয়ন্তী"র

উৎকর্ষ কোনখানে ? ছবিটাকে গ্রহণ করার অনুকূল দর্শক-মন তৈরী করা কি আমাদের হাতের মধ্যে ছিল না। যে চিত্রের মধ্যে প্রতিভার অভাব থাকবে তাকে প্রচার করার ভারও আমাদেরই নিতে হবে।

'ট্রেড-শো' দেখানর ব্যবস্থাও কিছু বদ্‌লাতে হবে। সাধারণের কাছে ছবি যেদিন মুক্তিলাভ করে সেইদিনই বা ২।১ দিন আগে পরে 'ট্রেড-শো' দেখান হয় এবং ছবির সমালোচনা প্রকাশিত হয় ২।৩ সপ্তাহ পরে যখন লোকের মুখে মুখে ছবি সম্বন্ধে গুজব ছড়িয়ে পড়েছে। কাজেই তা থেকে সিনেমা কোম্পানীর কোন উপকার হয় না।

> "সকলেরই বিশ্বাস, বাঙ্গালী চিরকাল দুর্ব্বল, চিরকাল ভীরু, চিরকাল স্ত্রীস্বভাব, চিরকাল ঘুসি দেখিলেই পলাইয়া যায়। মেকলে বাঙ্গালীর চরিত্র সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, এ রূপ জাতীয় নিন্দা কখন কোন লেখক কোন জাতি সম্বন্ধে কলমবন্দ করে নাই। ...মানুষকে মারিয়া ফেলিয়া তাহাকে মরা বলিলে মিথ্যা কথা বলা হয় না। কিন্তু যে বলে যে, বাঙ্গালীর চিরকাল এই চরিত্র, চিরকাল দুর্ব্বল, চিরকাল ভীরু, স্ত্রীস্বভাব, তাহার মাথায় বজ্রাঘাত হউক, তাহার কথা মিথ্যা।" —বঙ্কিমচন্দ্র

"মায়ের প্রাণ" চিত্রে —শ্রীমতী সরযূ বালা

আমার জীবন

(শেষখণ্ড)

গোপাল ভৌমিক

(৫)

র‍্যাডিশের কার্যকরী ব্যবসায়-বুদ্ধি মোটেই ছিল না ; সে যতটা কাজ করতে পারবে না ততটা কাজ হাতে নিত--মাইনের সময় হিসাবে ভুল করত--ফলে সব সময় তাকে ক্ষতি সহ্য করতে হ'ত। সে চিত্রাঙ্কনের কাজ--দৃশ্যাঙ্কনের কাজ—কাগজ লাগানোর কাজ করত—এমন কি সময় সময় টালি লাগানোর কাজও নিত। অনেক সময় তাকে সামান্য মাত্র লাভের জন্য টালির উদ্দেশ্যে ছুটোছুটি করতে দেখেছি ব'লে মনে পড়ে। সে চমৎকার কাজ জানত—অনেক সময় দিনে দশ রুব্‌ল্ পর্যন্ত সে রোজগার করত ; প্রভু হ'বার ইচ্ছা এবং ঠিকাদার ব'লে নিজের নাম জাহির করার ইচ্ছা না থাকলে সে হয়ত অনেক টাকা জমাতে পারত।

সে নিজে চুক্তিতে টাকা নিত—আমাকে এবং তার অধীন অন্যান্য লোককে সে দিন হিসাবে মজুরী দিত--এতে দিনে আমাদের পঁচাত্তর কোপেক্ থেকে এক রুব্‌ল্ পর্যন্ত পড়ত। যখন গরম এবং শুক্‌নো আব্‌হাওয়া থাক্‌ত তখন আমরা বাইরের কাজ করতাম—আমাদের প্রধান কাজ ছিল ছাদে রঙ দেওয়া। এসব কাজ করার অভ্যাস না থাকায় আমার পা গরম হ'য়ে যেত যেন আমি গরম চুল্লীর উপর দিয়ে হেঁটে বেড়িয়েছিলাম ; যখন ফেল্‌ট্ বুট্ পরতাম তখন পা' ফুলে' যেত। কিন্তু প্রথম দিকেই এরকম হ'ত। তারপর আমার অভ্যাস হ'য়ে গেলে সব কাজই ভাল রকম চল্‌ল। আমি সেই সব লোকের মাঝে বাস করতাম যাদের কাছে কাজ করা বাধ্যতামূলক এবং অনিবার্য, যারা বোঝাটানা ঘোড়ার মত কাজ করত, যারা শ্রমের নৈতিক মূল্য জান্‌ত না—এমন কি 'শ্রম' কথাটা কখনও কথাবার্তায় ব্যবহারও করতে না। তাদের মধ্যে থেকে আমিও নিজেকে বোঝাটানা ঘোড়ার মতই মনে করতে লাগ্‌লাম—ক্রমে কাজের আবশ্যকীয়তা এবং অলশ্যম্ভাবীতা সম্বন্ধে আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে গেল—এই বিশ্বাসই আমার জীবনকে সহজ ক'রে তুল্‌ল—আমাকে সন্দেহের হাত থেকে বাঁচাল।

প্রথমটা সব কিছুতেই আমোদ পেতাম—সবই নতুন ঠেক্‌ত। এ যেন ঠিক

পুনর্জন্মের মত। আমি মাটিতে শুতে' পার্‌তাম খালি পায়ে চলা ফেরা করতে পার্‌তাম—এরকম জীবন আমার কাছে খুব মধুর লাগ্‌ত। কাউকে কোনরূপ বিব্রত না ক'রে আমি সরল মানুষের জনতার মধ্যে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে পারতাম—যখন কোন গাড়ীর ঘোড়া প'ড়ে যেত তখন পোষাক ময়লা করার ভয় না ক'রে দৌড়ে গিয়ে ঘোড়াটাকে উঠ্‌তে সাহায্য কর্‌তাম। কিন্তু সব চেয়ে বড় কথা এই যে আমি স্বাধীন জীবন যাপন কর্‌ছিলাম কারও উপর ভার হ'য়ে ছিলাম না।

ছাদে রঙ্‌ লাগানো—বিশেষত—নিজেরাই যখন রঙ্‌ মিশাতাম - বেশ লাভ জনক ব্যবসা ব'লে বিবেচিত হয়; সেই জন্য র‍্যাডিশের মত ভাল কর্মীও এই ক্লান্তিজনক বিশ্রী কাজ কর্‌তে আপত্তি কর্‌ত না। ছোট পা'জামা প'ড়ে নিজের সরু মাংসপেশী বহুল পা' দেখিয়ে সে বকের মত ছাদে বেড়াত আর কাজ কর্‌তে কর্‌তে আমি তার ক্লান্ত দীর্ঘশ্বাস শুন্‌তে পেতাম: "পোকায় ঘাস খায়, মরিচায় লোহা ধ্বংস করে আর মিথ্যা মানবাত্মাকে ধ্বংস করে!"

অথবা কোন কথা ভাব্‌তে ভাব্‌তে সে নিজেই নিজের কথার জবাব দিত: "যে-কোন কিছু ঘট্‌তে পারে! যে-কোন কিছু ঘট্‌তে পারে!"

কাজের শেষে যখন বাড়ী ফির্‌তাম তখন দোকানের বাইরে ব'সে লোকেরা, দোকানের সহকারী কর্মচারীরা, ছেলেরা এবং তাদের প্রভুরা—সবাই মিলে আমার পিছনে চীৎকার করতে থাক্‌ত - আমায় উপহাস কর্‌ত। প্রথম প্রথম আমারখুব কষ্ট হ'ত।

"কম-লাভ!" তারা চীৎকার কর্‌ত, "গৃহ-চিত্রকর! হল্‌দে মাটি!"

যারা সবে মাত্র সাধারণ লোকের উপরে উঠেছে—যারা সেদিনও জীবিকা নির্বাহের জন্য কাজ ক'রেছে তাদের মত নির্দয় ব্যবহার আমার সঙ্গে কেউ কর্‌ত না। একদিন বাজারে লোহার দোকানের সামনে দিয়ে যাবার সময় এক বাল্‌তি জল এসে পড়্‌ল আমার গায়ে—যেন হঠাৎ; আরেকবার আমার দিকে একটা লাঠি ছুঁড়ে মারা হ'য়েছিল। একবার একটি বুড়ো আমার পথে দাঁড়িয়ে আমার দিকে বিষণ্ণ ভাবে তাকিয়ে বল্‌লে: "মূর্খ, তোমার জন্য আমি দুঃখিত নই, আমি দুঃখিত তোমার বাবার জন্য।"

পূর্ব পরিচিত কারও সঙ্গে দেখা হ'লে সে ঘাব্‌ড়ে যেত! কেউ কেউ আমাকে অদ্ভুত লোক—একটি অকাট মূর্খ ব'লে মনে কর্‌ত এবং আমার জন্য খুব দুঃখ প্রকাশ কর্‌ত; আরেক দল আমার সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করবে জান্‌ত না—তাদের বোঝা ছিল আমার পক্ষে মুস্কিল। একদিন দিনের বেলায় গ্রেট্‌ জেন্‌ট্রি স্ট্রীটের পাশেই একটা রাস্তায় অ্যানিউটা ব্লাগভোর

সঙ্গে দেখা। আমি কাজে যাচ্ছিলাম—হাতে ছিল লম্বা দুটি ব্রাশ্ এবং এক ভাণ্ড রঙ্। আমাকে চিন্‌তে পেরে অ্যানিউটা লজ্জিত হ'ল।

"দয়া ক'রে রাস্তায় আমার সঙ্গে আলাপ করবেন না" সে কম্পমান ভীরু অথচ দৃঢ় স্বরে বল্‌ল। সে আমার সঙ্গে করমর্দ্দন কর্‌ল না—তার চোখে জল চক্‌চক্ কর্‌ছিল। "আপনি যদি এরকমই হ'তে চান—তবে—তবে তাই হোক্ কিন্তু দয়া ক'রে সাধারণের সামনে আমায় এড়িয়ে চল্‌বেন।"

আমি গ্রেট্ জেন্‌ট্রি স্ট্রীট্ ছেড়ে দিয়ে ম্যাকারিখা নামক সহরতলীতে আমার ছোট বেলার আয়া কার্‌পোভ্‌নার বাড়ীতে বাস কর্‌ছিলাম। সৎ-স্বভাবা এই বুড়ীর কেমন একটা সদা বিষণ্ণভাব—সে সব কিছুতে অমঙ্গলের চিহ্ন পেত, বোল্‌তা এবং মৌমাছি তার ঘরে ঢুক্‌লেও সে অমঙ্গলের আশঙ্কা কর্‌ত। তার মতে আমার পক্ষে শ্রমিক হওয়াটাও মঙ্গলের ছিল না। "তোমার শেষ হ'য়ে গেছে।" সে বিষণ্ণভাবে ঘাড় নেড়ে বল্‌ত। "তুমি ব'য়ে গেছো।" তার সঙ্গে বাস কর্‌ত তার পালিত পুত্র প্রকোফি: সে কসাই—বিরাট কদাকার দেখ্‌তে—বছর ত্রিশেক বয়স—মাথায় লাল্‌চে চুল—মুখে ছোট ছোট গোঁফ। হলে তার সঙ্গে দেখা হ'লে সে নীরবে সসম্মানে আমার জন্য রাস্তা ক'রে দিত—আর মাতাল অবস্থায় থাক্‌লে সমস্ত হাত দিয়ে নমস্কার কর্‌ত। সে সন্ধ্যায় নৈশভোজ সমাপ্ত কর্‌ত—কাঠের দেয়ালের ওপার থেকে আমি শুন্‌তে পেতাম সে ঘোঁৎ ঘোঁৎ ক'রে গ্লাসের পর গ্লাস মদ খাচ্ছে।

"মা" সে নীচুগলায় বল্‌ত।

"কি ?" কার্‌পোভ্‌না উত্তর দিত। সে ওকে অত্যন্ত ভালবাস্‌ত। "কি, বাবা ?"

"আমি তোমার একটা উপকার কর্‌ব মা। এই 'চোখের জলের উপত্যকায়' তোমার বৃদ্ধ বয়সে আমি তোমার ভরণ পোষণ কর্‌ব—তারপর তুমি ম'রে গেলে নিজের খরচে কবর দেব। আমি যা' বল্‌ছি তা ঠিকই কর্‌ব।"

আমি রোজই সকালে শুতাম আর উঠ্‌তাম সূর্য্য উঠবার আগে। আমরা চিত্রকরেরা পেট ভ'রে খেতাম আর ভালভাবে ঘুমুতাম। কেবল মাত্র রাত্রিতেই আমাদের যা'—কিছু উত্তেজনা হ'ত। আমি কখনও সহকর্মিদের সাথে ঝগড়া কর্‌তাম না। সারাদিন ধ'রে অন্তহীন গাল, অভিশাপ এবং আন্তরিক শুভকামনার স্রোত ব'য়ে যেত যেমন ধরা যাক্ ওর চোখ খ'সে যাক্ কিংবা ওর কলেরায় মৃত্যু হোক্, কিন্তু সব সত্ত্বেও আমাদের নিজেদের মধ্যে খুব বন্ধুত্ব ছিল। আমার সহকর্মিরা সবাই আমাকে ধর্মোৎসাহী ব'লে সন্দেহ কর্‌ত এবং আমাকে নিয়ে নির্দোষ আমোদ কর্‌ত এই ব'লে যে আমার বাবাও আমার

নিন্দা করেন। তারা বল্‌ত যে তারা খুব কমই গির্জায় যায়—তাদের মধ্যে অনেকেই দশবৎসর ধ'রে কোন ধর্মসম্বন্ধীয় স্বীকারোক্তি করে নি' এবং তারা তাদের ধর্মবিষয়ে উৎসাহহীনতা এই বলে সমর্থন করত যে পাখীদের মধ্যে যেমন দাঁড়কাক, মানুষের মধ্যে গৃহ-চিত্রকরও তেমনি।

আমার সহকর্মিরা আমাকে সম্মান এবং শ্রদ্ধা কর্‌ত; তারা স্পষ্টতই আমার মদ-না-খাওয়া, আমার ধূমপান-না-করা এবং আমার নিরিবিলি স্থির জীবন যাপন পছন্দ করত। তারা শুধু আশ্চর্যান্বিত হ'ত আমার তেল চুরি না করাতে এবং তাদের সঙ্গে মালিকদের কাছে মদ্যপানের আবেদন জানাতে না যাওয়াতে। মালিকের তেল এবং রঙ্‌ চুরি করাটা গৃহ-চিত্রকরদের রীতি—এটা মোটেই চুরি ব'লে বিবেচিত হ'ত না। র‍্যাডিশের মত সাধুলোকও কাজ থেকে ফেরার সময় কিছু শাদা সীসা আর তেল নিয়ে আস্‌ত। ম্যাকারিথায় যাদের বাড়ী ছিল এমন শ্রদ্ধেয় বুড়োরাও ঘুষ চাইতে লজ্জা পেত না; কোন কাজের প্রথমে কিংবা শেষে সবাই যখন কোন কোন অশিক্ষিত মূর্খের কাছে গিয়ে কয়েক পেনির জন্য ধন্যবাদ দিত— তখন আমি খুব অস্বস্তি এবং দুঃখ অনুভব কর্‌তাম।

গ্রাহকদের সঙ্গে তারা ধূর্ত সভাসদের মত ব্যবহার করত– প্রায় রোজই আমার মনে প'ড়ে যেত সেক্‌স্‌পীয়ারের পলোনিয়াসের কথা।

আকাশের দিকে তাকিয়ে কোন গ্রাহক হয়ত বল্‌ল "সম্ভব বৃষ্টি হ'বে।" "নিশ্চয়ই বৃষ্টি হবে।" গৃহচিত্রকররা সায় দিত।

"কিন্তু মেঘ দেখে ত বোঝা যাচ্ছে না যে বৃষ্টি হবে। হয়ত বৃষ্টি হবে না!"

"না মহাশয় বৃষ্টি হবে না। বৃষ্টি হ'বে না—নিশ্চয়ই হ'বে না।"

আড়ালে তারা গ্রাহকদের উপহাস করত; যখন কোন ভদ্রলোককে সংবাদপত্র পড়্‌তে দেখত তখন বল্‌ত: "ওঃ, খবরের কাগজ পড়্‌ছে— ওদিকে ঘরে ত খাবার নেই!"

আমি কখনও বাড়ী যেতাম না। কাজ থেকে ফিরে' প্রায়ই বোনের চিঠি পেতাম এই সব চিঠিতে পিতার সম্বন্ধে সব অস্বস্তিকর সংবাদ থাকৃত– তিনি নাকি খাবার সময় অন্যমনস্ক থাক্‌তেন, বহুক্ষণ ধ'রে পড়ার ঘরে থাক্‌তেন—বাইরে আস্‌তেন না বড় বেশী। এরকম খবর আমায় বিব্রত ক'রে তুল্‌ত আমি রাত্রিতে ঘুমোতে পার্‌তাম না। আমি অনেকদিন রাত্রে গ্রেট্‌ জেন্ট্রি স্ট্রীটে যেতাম– আমাদের বাড়ীর সামনে দিয়ে হাঁটতাম আর অন্ধকার জানালাগুলোর দিকে তাকিয়ে ভাবতাম যে ভিতরে সবাই ভাল আছেন কি না। রবিবার দিন আমার বোন দেখা করতে আস্‌ত কিন্তু আস্‌ত চুরি ক'রে যেন আমাকে

দেখতে আসে নি'—এসেছে আমাদের ভূতপূর্ব আয়াকে দেখতে। সে যদি আমার ঘরে আস্‌ত—তার মুখ হয়ে উঠত বিবর্ণ—চোখ লাল আর সে কান্না শুরু করত।

"বাবা আর বেশীদিন সহ্য করতে পারবেন না"—সে বল্‌ত। "ভগবান্ না করুন তাঁর যদি কিছু হয়, চিরজীবন ধ'রে তোমার বিবেকের কাছে তুমি দায়ী থাকবে। এটা ভয়ঙ্কর, মিসেল্! আমি প্রার্থনা করছি অন্তত মায়ের কথা স্মরণ ক'রেও তুমি তোমার জীবনযাত্রা প্রণালী শোধরাও!"

"শোন বোন" আমি উত্তর দেই "আমার যখন দৃঢ় বিশ্বাস যে আমি বিবেক অনুযায়ী কাজ করছি তখন আমি কি ক'রে আত্ম সংশোধন করি? আমার কথা বোঝার চেষ্টা কর!"

"আমি জানি তুমি তোমার বিবেকের অনুসরণ করছ কিন্তু কাউকে আঘাত না দিয়েও বোধ হয় তা' করা যায়!"

"হায় ভগবান!" দরজার বাইরে থেকে বৃদ্ধা আয়ার দীর্ঘশ্বাস শোনা যায়। "তুমি শেষ হ'য়ে গেছ! নিশ্চয়ই একটা বিপদ হ'বে বৎস! নিশ্চয়ই বিপদ ঘট্‌বে!"

(ক্রমশ)

"গীতিকাব্য অকৃত্রিম, কেননা তাহা আমাদের নিজের হৃদয় কাননের পুষ্প, আর মহাকাব্য শিল্প, কেননা তাহা পর হৃদয়ের অনুকরণ মাত্র। এই নিমিত্ত আমরা বাল্মীকি, ব্যাস, হোমর, ভার্জ্জিল প্রভৃতি প্রাচীনকালের কবিদিগের ন্যায় মহাকাব্য লিখিতে পারিব না; কেন না সেই প্রাচীনকালে লোকে সভ্যতার আচ্ছাদনে হৃদয় গোপন করিতে জানিত না, সুতরাং কবি হৃদয় প্রত্যক্ষ করিয়া সেই অনাবৃত হৃদয় সকল সহজেই চিত্র করিতে পারিতেন।"

—রবীন্দ্রনাথ

দেশ বিদেশের চলচ্চিত্র

গো. চ. রা.

জাপানের কথা

জাপান প্রাচ্যের প্রান্ত প্রদেশ। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের লীলাভূমি। রূপ সৃষ্টি জাপানী চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। জাপানের জাতীয় জীবনের প্রতি পরতে পরতে অনাড়ম্বর সরল মাধুর্য্য স্থায়ী করিবার প্রচেষ্টা বিদেশীরা লক্ষ্য করে। বিদেশীদের চক্ষে জাপানী চরিত্রের যে চিত্র ফুটিয়া উঠে তাহাতে দেখা যায় যে জাপানী হৃদয়ে আছে অনুভূতি, মুখে আছে সহজ হাসি, চিত্তে আছে প্রফুল্লতা, অন্তরে আছে এমন এক প্রশান্ত ভাব যাহা সামান্য ক্ষুদ্রতা, নীচতায় উদ্বেলিত হয় না—যাহা গভীরতায় এত বিস্তৃত যে উৎকট উত্তেজনায় অথবা দারুণ দুর্দ্দশায় থাকে স্থির, অচঞ্চল। বেদনা বা মৃত্যু থাকে সে দৃশ্যের সম্মুখে মূক। জড় প্রকৃতির লক্ষণ সেখানে হইয়াছে ম্লান। বুদ্ধির তীক্ষ্নতা, হস্তপদের ক্ষিপ্রতা সেখানে অতল স্নিগ্ধ জলধি মাঝে শ্যামল ধরিত্রী বক্ষে উত্তপ্ত আগ্নেয়গিরির মতই অসঙ্গতিপূর্ণ। দ্বীপবাসীর স্বভাবে যে স্বাতন্ত্র্য দেখা যাওয়া সম্ভব, তাহার মূলে থাকে বহির্জগৎ হইতে বিচ্ছিন্নতা; আর, এই বিচ্ছিন্নতাই দ্বীপবাসীর মনে জাগায় বহির্জগতকে জানিবার জন্য এক অপরিসীম কৌতূহল। আবার বিস্তৃত ভূভাগের জন-কোলাহলের সঙ্গ লাভের অভিজ্ঞতা, দ্বীপের নির্জ্জনতায় সম্পূর্ণ পৃথক অর্থ ধারণ করে। জাপানী-চরিত্রে ইহার অন্যথা হয় নাই। জাপানীরা অপরের সৃষ্টি দেখিয়াছে, দেখিয়া দেশে ফিরিয়াছে, দেশে ফিরিয়া যাহা সৃষ্টি করিয়াছে তাহা বিদেশী সৃষ্টির সম্পূর্ণ অনুকরণ নয়; তাহার মধ্যে অধিক পরিমাণে যাহা আছে তাহা জাপানী, বিদেশী নয়। ইহা সে প্রমাণ করিয়াছে।

চলচ্চিত্র জাপানে নূতন। বর্ত্তমান সভ্যতার শিল্প জাপান নূতন শিখিয়াছে। চলচ্চিত্র শিল্পও জাপান অপরের নিকট শিখিয়া অল্প দিনেই নিজস্ব করিয়া লইয়াছে। সৌন্দর্য্য ও সরলতার জ্ঞানে ও ব্যবহারিক প্রয়োগে জাপানের একটি নিজস্ব সত্তা আছে। ইহাই যেমন তাহার গৃহ-প্রাঙ্গনের উদ্যান রচনায় পরিস্ফুট হয়, তেমনি পরিস্ফুট হয় তাহার কারুকার্য্যে, স্থাপত্যে, কলায়, আবার তেমনি পরিস্ফুট হয় চলচ্চিত্রে। সকল কাজে জাপানীদের আছে নিষ্ঠা, একাগ্রতা, পরিচ্ছন্নতা। চলচ্চিত্র রচনায় তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই।

জাতীয় জীবনে স্বাতন্ত্র্য-বোধ তাহাকে করিয়াছে বিকটভাবে আত্মমর্য্যাদাশীল। পিতৃপুরুষ তর্পণে, রাজ-আনুগত্যে, দেশানুরাগে, বীরগাথা-কীর্ত্তনে সে কাহারও অপেক্ষা ন্যূণতা স্বীকার করিতে যায় না। সমাজ জীবনে ইহাই তাহার মূল বক্তব্য! চলচ্চিত্রের বিষয়বস্তুতেও সে তাহাই দেখিতে চায়, শুনিতে চায়!

চলচ্চিত্র উৎপাদনের প্রারম্ভে জাপানে যে বিদেশী চিত্র প্রদর্শিত হইত তাহা প্রধাণত ফরাসী ও ইতালীয়। গত যুদ্ধের সময় ইউরোপীয় অব্যবস্থার সুযোগে আমেরিকান চিত্র জাপানে প্রবেশ লাভ করে বটে, কিন্তু যুদ্ধের পর জাপানে শিল্পনিষ্ঠা এত দ্রুত-গতিতে প্রসার লাভ করে যে কয়েক বৎসরের মধ্যে কি ইউরোপীয়, কি আমেরিকান প্রায় সমস্ত বিদেশী চিত্রই জাপানে আর কোন আগ্রহ সৃষ্টি করিতে পারে না। বিদেশী চিত্রে স্বদেশী ভাষায় বিষয়বস্তুর বিবৃতি ও ঘটনার বৃত্তান্ত রচিত না থাকিলে সে চিত্র জাপানে লোকরঞ্জন করিতে পারে নাই। বিদেশী ভাষায় অপারদর্শিতা স্বীকার করিতে জাপান কখনও কুণ্ঠা বোধ করে নাই। জাপানী-স্বদেশী চিত্রের মধ্যে জাপান তাহার নিজস্ব প্রয়োজনীয়-বস্তুর অস্তিত্ব খুঁজিয়াছে।

জাপানে প্রথম যুগের চলচ্চিত্র অভিজাত-সমাজে আদরণীয় হয় নাই। মজুর ও নিম্নমধ্য-শ্রেণীর মধ্যে ইহা প্রথম প্রসার লাভ করে এবং পরে ক্রমশ স্বদেশী চিত্রের প্রাচুর্য্য হওয়ার সাথে সাথে সমাজের উচ্চ হইতে উচ্চতর স্তরের মধ্যে ইহা বিস্তার লাভ করে। রুচি সম্বন্ধে সাধারণ প্রচলিত নিয়ম এই যে, ইহা নিম্নগামী। প্রথমে সমাজের উচ্চস্তরে যে রুচি দেখা দেয় সাধারণত তাহাই ক্রমশ নিম্নস্তরে সংক্রামিত হয়। চলচ্চিত্রের রুচি জাপানে বিপরীত পথে চলিয়াছে—ইহা জাপানে উর্দ্ধগামী হইয়াছে, এবং স্বদেশীয়ানা এ বিষয় প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। উচ্চস্তরের নরনারীর চিত্ত বৃত্তির উপর বিদেশী মনোভাব বিস্তার লাভ না করে এ-বিষয়ে সতর্কতা বোধ হয় হয় জাপানীদের লক্ষ্য।

চলচ্চিত্র উৎপাদনে জাপান স্বাবলম্বী হইয়াছে দ্রুতগতিতে; যেটুকু বিলম্ব হইয়াছে তাহা তাহার বিবিধ শিল্পপ্রচেষ্টায় যেটুকু বিলম্ব হইয়াছে তাহার জন্য। ক্যামেরা, লেন্স, বাল্ব, সেলুলয়েড, কেমিক্যাল, যাবতীয় শিল্প ক্ষিপ্র গতিতে বৃদ্ধি লাভ করিয়াছে এবং তেমনি ক্ষিপ্র গতিতে জাপানে স্বদেশী চলচ্চিত্রও উন্নতি লাভ করিয়াছে। অল্পদিনেই জাপানের প্রতি নগরে, নগর হইতে গ্রামে চলচ্চিত্রের অভিযান বিজয় কেতন উড্ডীন করে। এমন কি গ্রামের চিত্রশালাতেও ৪০০ হইতে ৩০০০ দর্শকের আসনের ব্যবস্থা দেখা যায়। সাত আট বৎসর পূর্ব্বে সমগ্র জাপানে প্রায় ১৫০০ স্থায়ী ও ৭৮০০০ অস্থায়ী চিত্রশালা ছিল—এবং বৎসরে দর্শকের সংখ্যা ছিল প্রায় ২২½ কোটি, তন্মধ্যে বালক বালিকার সংখ্যা ছিল প্রায় ৫½

কোটি। ১৯৪১ সালে এই সংখ্যাগুলি দেড়গুণ বাড়িয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। দর্শকের শ্রেণী বিভাগ করিলে দেখা যাইবে, পুরুষ ও নারী এই দুই শ্রেণীর মধ্যে নারী শ্রেণীই অনেক বেশী এবং এ দুই শ্রেণীর অনুপাত তিন ভাগে এক ভাগে। আর নারী দর্শকেরা সংখ্যাতে যেমন প্রবল, চিত্রের বিষয়বস্তু উপভোগেও তেমনি সজাগ। বিষয়বস্তুতে লঘু চিত্ততা, প্রগলভতা বা কৌতুক তাহাদের তুষ্ট করিতে পারে না, তাহারা চায় এমন চিত্র যে চিত্রে থাকিবে কঠোরতা—যে কঠোরতার দৃশ্যে ও অভিনয়ে হৃদয় যেন দ্রবীভূত হয় আর নয়নের ফল্গুধারা স্বতই বেগে প্রবাহিত হয়। অশ্রুধারায় চিত্ত পরিশ্রুত করাই যেন জাপানী নারীর চলচ্চিত্র দর্শনের প্রধান কারণ। যে দুইটী বিভিন্ন স্রোত জাতীয় জীবনে প্রবাহিত তাহাই জাপানী চলচ্চিত্রে প্রকাশ লাভ করিয়াছে। প্রাচ্যের প্রান্তে অবস্থিত হইয়াও প্রাচ্যের নাটকীয় অভিব্যক্তি জাপানী চলচ্চিত্রের অভিব্যক্তি অতিক্রম করিতে পারিয়াছে অল্প সময়ে। চলচ্চিত্রের অভিব্যক্তি নাটকাভিনয়ের যে পরবর্ত্তী সংস্করণ, এ জ্ঞান জাপানী চলচ্চিত্র পরিচালকেরা আয়ত্ত করিয়াছে। প্রাচ্যের আড়ম্বর, জড়তা ও অস্পষ্টতা জাপানী চলচ্চিত্রকে অভিভূত করিতে পারে নাই—সরল অথচ দৃঢ় ভাব এবং তীক্ষ্ণ ছায়া জাপানী চলচ্চিত্রে ক্রম বর্দ্ধমান গতিতে প্রকটিত হইয়াছে। আবার, পৌরাণিক কাহিনী ও ইতিবৃত্তের প্রতি প্রাচ্যের যে অনুরাগ, কি নাট্যাভিনয়ে, কি চলচ্চিত্র প্রদর্শনীতে দেখা যায়, জাপানী চলচ্চিত্র তাহা হইতে অব্যহতি পায় নাই।

জাতির প্রাণের সাড়া সকল কর্ম্মতৎপরতায় ও রূপ সৃষ্টিতে এমন কি চলচ্চিত্র সম্পাদনেও সে জাগিয়া উঠে—জাপানী চলচ্চিত্রের ইতিহাসে তাহাই পরিলক্ষিত হয়।

[এন্সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা ; এন্সাইক্লোপিডিয়া অব্ সোস্যাল্ সায়েন্স ; 'দি ফিল্ম টিল্ নাও'—পল্ রোথা প্রণীত ; 'মেড্ ইন্ জাপান'—গুন্থার ষ্টিন্ প্রণীত ; 'জাপান ইয়ার বুক' প্রভৃতি গ্রন্থ অবলম্বনে লিখিত। লেখক।]

নারী

সাধনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

নারী তুমি কেন্দ্রিকা শক্তি। রস যখন আবেশে কাতর পথবিহ্বল, সৃষ্টির মূলতত্ত্ব সন্ধানে শ্রান্ত, তুমি নারী তখন কেন্দ্রিক শান্তি। পথভ্রষ্টের তুমি রসনায়িকা। পথহারা পথিকের রসদিক্-নির্ণয়িনী। রস যখন রসিকের চিত্তবিভ্রম আনে তুমি নারী হান তখন প্রেমতূণীর প্রেমাতুর বক্ষে।—রক্ষা কর রসমর্যাদা রসমানসের বিশ্বায়তনে। রসময়ী নারী, তুমি ধন্য তুমি বরেণ্য। রসকেন্দ্রাত্মিকা রমণী তোমার সাহচর্য তোমার সাহিত্য একান্ত ধর্ম অন্তরে বাহিরে আচারে প্রসারে! পরমা প্রকৃতি নারী, তোমাকে জানাই আমার আন্তরনিত আন্তর প্রীতি অবাধ বাসনার অসীম প্রগতি! তুমি রাখ তুমি পাল! নারী তুমি কেন্দ্রিক সত্য। মহাসত্যের সন্ধানে সহধর্মী বৃত্তি। সর্বমিলনের মহাতীর্থে যে সত্যের পাই সন্ধান, নারী তুমিই আছ সেথা বেদিবর্তিণা দেবী মূর্তি। মন্দিরে তোমারি গড়ি প্রতিমা, ওগো মানসী তোমার প্রসাদেই সত্যের প্রেরণা পাই! বন্দে মাতরম্!

যুগে যুগে কালে কালে স্তরে স্তরে মহাক্ষণ সমরে মহাকালরমণী তুমি নারী। তোমার নৃত্যে তোমার গীতে নারী কতকোটি গীতাবেদাংগ হল রচিত হবে বা কত শত! কালশবে তুমিই দিয়েছ দিতেছ সত্যের নানা প্রাণ কত কাব্যে কত ছন্দে! তোমার নৃত্যের ছন্দতালে স্পন্দন পেল কত সাধনা আত্মসমর্পিত কত সাধকের অন্তরে! মূর্তি তোমার দেখেছি কত দেখব কত আর মহাকাল বক্ষে! নারী তোমার চুম্বনে কত শিশু পেল প্রাণ, কত যুবকের কত ছন্দে এনে দিল রসের নিতান, কত সুন্দরীর রঙীন নেশায় গড়ে দিল শিবের মহিম প্রতিষ্ঠান! নারী তোমার বুকে মার-হরা সুধা। চিণ্ময়ী ক্ষুধা তোমার দীপ্ত শিহরণে! মর জগতে তুমিই এনেছ নারী অমৃতের মন্দাকিনী। জড় সংসারে তুমি নারী চিচ্চমকা সচ্চিদানন্দ-রূপা। প্রেমকল্পতরু নারী, তোমার স্নিগ্ধচ্ছায়ে জুড়াল কত যুগে কত নর রেখে গেল ইতিহাস তার তোমারি কীর্তি ঘোষণায়! সন্ন্যাসীর ভগবতী সংসারীর রসবতী যোগীর মহীয়সী নারী তুমি। সন্ন্যাসে শুদ্ধা সংসারে শুভা যোগে তৃপ্তি ভোগে প্রীতি কেন্দ্রিকা শক্তি কেন্দ্রিক সত্যরূপা কল্যাণী—প্রণাম! বন্দে মাতরম্!

পরিচয়

গ্রন্থ

পৃথিবীর বড় মানুষ—গোপাল ভৌমিক। মডার্ণ বুক এজেন্সী, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। দাম বারো আনা।

চোদ্দজন বিশ্ববিখ্যাত মহামনীষীর জীবনী কিশোর-কিশোরীদের উপযোগী ক'রে লিখে শ্রীযুক্ত গোপাল ভৌমিক আমাদের ধন্যবাদভাজন হ'য়েছেন। আমাদের শিশু-সাহিত্য অথবা কিশোর-সাহিত্য ভুতুড়ে-গল্পে, রূপকথায় ও আজগুবী কাহিনীতে ঠাসা। তার মধ্যে অন্যান্য প্রয়োজনীয় কথা শিশুদের কাণে পৌঁছে দেওয়ার রাস্তা পাওয়া দুষ্কর। জীবনী-পাঠের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে চাইনে, তবে, কিশোর মনে মহাপুরুষের উত্থান-পথের ধাপগুলো যদি স্পষ্টাক্ষরে গেঁথে দেওয়া যায়, তার ফল খারাপ না হবারই সম্ভাবনা। স্থানান্তরে মহাপুরুষদের জীবনী প'ড়ে আমাদেরও অনেক আগে থেকেই এই ধারণা হ'য়েছে যে সেই মহাপুরুষেরা তাঁদের পূর্বতন মহাপুরুষদের জীবনী থেকে উৎসাহ সঞ্চয় ক'রেছিলেন। এখন যারা অখ্যাত কিশোর, তাদের মধ্যের কেউ কোনোদিন মহাপুরুষ হবে না—জোর ক'রে এমন কথা বলতে পারি নে। আলোচ্য গ্রন্থটি সেই অখ্যাত কিশোরদের পথের সন্ধান দিতে পারবে ব'লে আশা রাখি। আমাদের দেশী পৃথিবীর-বড়-মানুষ-দের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ মাত্র স্থান পেয়েছেন, এ ছাড়া বিদেশী কয়েকজন আছেন। সব চেয়ে ভালো লাগলো, হেলেন কেলারের, কাহিনী ও প্রথম অমুসলমান মক্কাযাত্রীর কথা। হেলেন কেলার সম্বন্ধে আমাদের দেশে বেশী আলোচনা ইতিপূর্বে হয় নি, শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন দত্ত 'হেলেন কেলার' নাম দিয়ে একটি পুস্তিকা প্রকাশ ক'রেছেন বছর দশ আগে, কিন্তু তার প্রচার নেই। আশা করি, এই গ্রন্থের জীবনী-কয়টি কয়েকটি নতুন জীবন গঠনে সহায়তা করবে।

সুশীল রায়

কবির প্রেম শিবপদ চক্রবর্ত্তী। প্রাপ্তিস্থান—ডি, এম, লাইব্রেরী, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম। বারো আনা।

নাটিকা, নাটক নক্সা, নক্সা, বড়গল্প ইত্যাদি বিভিন্ন জাতীয় রচনা একত্রিত ক'রে প্রথম নাটকটির নাম অনুসারে বইটির নাম রাখা হ'য়েছে। লেখক হয়ত নতুন কলম ধ'রেছেন, তাই কলম এখনো বাগিয়ে ধরার কায়দা শিখে উঠ্‌তে পারেন নি। 'লেটার বক্স' নামক নাটক-নক্সাটির আইডিয়া মন্দ না (যদিও মৌলিকও নয়), তবে লেখার ভঙ্গী ভালো নয়। আমরা লেখকের 'কবির প্রেম' নামক নাটিকার নরেন নামক চরিত্রের মুখের কথাটি তুলে দিয়ে আমাদের বক্তব্য পরিষ্কার করতে চাই: "হায় রে বাংলা দেশ! হায় রে তার কবি! এদের দেখলে সত্যই দুঃখ হয়। কেন জান? এই সব অকালপক

মেরুদণ্ডভাঙ্গা কবির দল, সাহিত্যিকের দল, ভাবুকের দল—এরা জহরত আর কাচের পার্থক্য বোঝেনা। এরা কাচকে জহর বলে বুকে রাখতে চায় আর জহরকে কাচ বলে দূরে ফেলে দেয়। হা ভগবান! কবে যে এদের চোখ ফুটবে!"

লেখক এত কথা কাদের উদ্দেশ ক'রে লিখলেন জানিনে! তবে আশঙ্কা হয়—নিজেকে তিনি নিঃসঙ্কোচে আক্রমণ করেন নি তো?

হিটলারের পতন—প্রভাশ দাশ। বরেন্দ্র লাইব্রেরী, ২০৪ কর্ণোয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম পাঁচ সিক'।

আলোচ্য গ্রন্থ কয়েকটি গল্পের সমষ্টি, শেষ গল্পটির নাম অনুযায়ী গ্রন্থের নামকরণ হইয়াছে। আমরা অন্যান্য গল্পের কথা কিছু বলিব না, শেষ গল্পটির অর্থাৎ 'হিটলারের পতন'টির, মাত্র আলোচনা করিব। গল্পটির সহিত স্বনামধন্য হিটলারের কোনো সম্বন্ধ নাই, মিস্ তমসা নামক একটি তরুণীকে কেন যেন হিটলার বলা হইয়াছে। হিটলারকে আমরা স্বচক্ষে দেখি নাই, লেখকও মিস্ তমসাকে দেখেন নাই, কেন না তিনি সাফ ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন, 'মিস্ তমসা আমার সম্পূর্ণ কাল্পনিক নায়িকা'। আমরা এ-কথা শুনিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। কিন্তু গল্পটি পড়িয়া চিন্তা বাড়িল। ভাবিতেছি, যাহারা যাহারা বেকার আছে, তাহারা সকলেই গল্প লিখিতেছে না কেন, গল্প লেখা এমন তো বিশেষ কষ্টের কাজ নয়! গল্পের প্লটের কথা তুলিব না, দশ পাতার গল্প হইতে কয়েকটি শব্দ তুলিয়া দিতেছি মাত্র: ঝাঞ্চা (ঝাঞ্জা), প্রপাগেণ্ডা, সিক্থ্ ইয়ার, চুম্বুকের মত, বাউজ (ব্লাউজ?), কেন্ডিডেট, ফ্লাসের (ক্লাসের?), জেণ্টেম্যান (জেণ্টল্ম্যান?), নির্দ্দোষী, নিলর্জ্জ, কম্পেলেন (কম্প্লেন?), সেভেজ ব্রুট...

এ বিষয়ে আর অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন।

মঞ্জু সেন

উত্তর ফাল্গুনী—সুধীন্দ্র নাথ দত্ত। পরিচয় কার্যালয়, কলিকাতা।

উত্তর ফাল্গুনী সুধীন্দ্রনাথ দত্তের আধুনিকতম কবিতার বই। বর্তমান বইখানিতে সর্বশুদ্ধ উনিশটি কবিতা স্থান পেয়েছে। ইতিপূর্বে প্রকাশিত তাঁর 'তন্বী', 'অর্কেষ্ট্রা এবং 'ক্রন্দসী' কাব্যগ্রন্থের প্রভাবে সুধীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে যে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন, তাঁর বর্তমান কাব্য-গ্রন্থ সে-প্রতিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ রাখতে পারবে ব'লেই আমার বিশ্বাস। তাঁর কবি-প্রতিভার যে-সব বৈশিষ্ট্য, তার প্রায় সবগুলিরই সুষ্ঠু পরিণতি লক্ষ্য করলাম এ বইখানিতে। তাই মনে হয় যে তাঁর কবি-প্রতিভার পরিণতির দিক থেকে এ বইটির ঐতিহাসিক মূল্যও আছে যথেষ্ট।

সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা সুখ-পাঠ্য বটে কিন্তু সহজ-পাঠ্য নয়: একদল লোকের কাছে এই দুরূহতাই সুধীন্দ্র-কাব্যের বড় বৈশিষ্ট্য। তাঁর কবিতায় সংস্কৃতশব্দ-বহুলতার থেকেই বোধ হয় এই দুরূহতার উৎপত্তি: শব্দ এবং উপমা-উৎপ্রেক্ষা সঞ্চয়নের দিক থেকে সুধীন্দ্রনাথ পুরোদস্তুর ক্লাসিক্ পন্থী। তাঁর সংস্কৃতিশীল আধুনিক মনের সংগে এই ক্লাসিক্ পন্থার বৈসাদৃশ্য লক্ষনীয়। সরল ভাষার সাহায্যে কি ক'রে সুষ্ঠুভাবে অন্তরের গভীরতম ভাব প্রকাশ করতে হয় রবীন্দ্র কাব্যই বোধ হয় তার

প্রকৃষ্ট উদাহরণ। রবীন্দ্র-কাব্যের এই অপূর্ব ভাষার সরলতা তাঁর লোকোত্তর প্রতিভার অংগীভূত—কাজেই অননুকরণীয়। রবীন্দ্রনাথের এই রচনা রীতির ব্যর্থ অনুকরণ করতে গিয়ে রবীন্দ্র-পরবর্তী কবিরা অনেকেই বাংলা কবিতাকে শুধুমাত্র মিষ্টি কথার স্তূপে পরিণত করেছিলেন। সুধীন্দ্রনাথ এই দুর্বলতা এবং অধঃপতন লক্ষ্য করেছিলেন—তার প্রতিবাদস্বরূপই তিনি বোধ হয় তাঁর কবিতায় দুরূহ শব্দের আমদানী করে বাংলা কবিতার মোড় ফিরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন পৌরুষের দিকে। তাঁর আদি উদ্দেশ্য যাই থাক্, অধুনা দুরূহতা যে সুধীন্দ্রনাথের কবিতার একটি বিশিষ্ট অংগ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। শিরদাঁড়া খাড়া ক'রে সজাগ সক্রিয় মস্তিষ্ক নিয়ে তাঁর কবিতা পড়্‌তে হয়। আমার মতে সুধীন্দ্রনাথের কবিতার বড় বৈশিষ্ট্য হ'চ্ছে সংযম এবং পৌরুষ। শিল্পীর পক্ষে সংযম যে কত প্রয়োজনীয় তা' বোধ হয় বুঝিয়ে বলা নিষ্প্রয়োজন। ভাষা এবং ভাব দুদিক থেকেই সুধীন্দ্রনাথকে সংযমী শিল্পী বলা চলে। ভাব প্রকাশের উপযোগী সুষ্ঠু শব্দ চয়নে সুধীন্দ্রনাথের মত কৃতী শিল্পী বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে খুব কম আছেন বলেই আমার বিশ্বাস। তিনি অত্যন্ত সজাগ শিল্পী: অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা করে তবে তিনি শব্দ প্রয়োগ করেন।

এ বইয়ের বেশীর ভাগই প্রেমের কবিতা: কবির মানসিক পট পরিবর্তনের সংগে তাদের নিবিড় আত্মিক যোগ আছে। অবস্থা ভেদে এই সব কবিতা কখনও হয়ে উঠেছে গম্ভীর—কখনও বা লঘু। কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যও কবির আত্ম-বিভ্রম ঘটেনি: তাঁর সজাগ বুদ্ধি এবং সমৃদ্ধ মনের ছাপ আছে সর্বত্র। কোথাও তাঁর পরিপূর্ণ সংযমের বিচ্যুতি দেখা যায় না। সুধীন্দ্র নাথ প্রধানত দেহাত্ম-বাদী কবি: মাটির সংগে তাঁর যোগ তাই আন্তরিক। এই বইয়ের বেশীর ভাগ কবিতা তাই কবি-মনের অনুভূতি এবং অভিজ্ঞতায় রঞ্জিত; আমাদের কাছে তাদের আবেদনও তাই এত বেশী সহজ এবং প্রত্যক্ষ। দেহাত্মবাদী কবি নিজের সম্বন্ধে বলেছেন:

> কেমনে তাদের বলি নই আমি অমরা-বিলাসী,
> মর্ত্ত্যের সূচ্যগ্র কোণ একমাত্র অভিষ্ট আমার;
> ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি স্থিতি সে সবে এ হৃদয় উদাসী,
> উত্থান পতন মম ক্ষণিকার নিষ্ঠায় অসার।"

দেহাত্ম-বাদের সংগে আদিরস আসা স্বাভাবিক; সুধীন্দ্রনাথের মধ্যেও আদিরস আছে। কিন্তু তিনি অপূর্ব শালীনতার সংগে সে রসের অবতারণা করেছেন। আবেগ ও বুদ্ধির অভিজাত সংমিশ্রণে এই সব অংশ পরম উপভোগ্য হয়েছে। দু একটি উদাহরণ দিলেই আমার বক্তব্য স্পষ্ট হবে:

> কদম-রেণু বিছানো সরণী তো
> সুনাভি হতে ছুটে নি অভিযানে
> কদলী-উরু-তোরণ সুশোভিত
> লব্ধকাম অমরাবতী পানে।

অথবা

> নিবিদ ভাষায় যবে নিরাকার নাস্তি বাখানিবে

অনঙ্গ আত্মার ঋদ্ধি, বুঝিবে কি সেদিন প্রথমে
প্রণয়ের জয়স্তম্ভ ঠেকে গিয়ে যদিও ত্রিদিবে,
বদ্ধমূল ভিত্তি তার তবু কাম-কারণ-কর্দমে।

শেষোক্ত পংক্তি কয়টির কটাক্ষ শ্লেষ উপভোগ্য হলেও এর পিছনে অতৃপ্তির একটা করুণ ক্রন্দন চাপা আছে বলেই আমার বিশ্বাস। সম্পূর্ণ কবিতা না পড়লে তার রস উপভোগ করা যায় না বলে আর উদ্ধৃতি দিয়ে রচনা ভারাক্রান্ত করতে চাই না। ভাববার এবং উপভোগ করবার মত অসংখ্য পংক্তি আছে 'উত্তর-ফাল্গুনীতে। প্রেমের কবিতাগুলির মধ্যে আমার সবচেয়ে ভালো লেগেছে সংশয়, নিরুক্তি, বিলয়, ব্যবধান, ত্বংসময় এবং অহৈতুকী।

এই বইয়ের শর্বরী, প্রতিপদ, অনন্নুতপ্ত, মরণতরী প্রভৃতি কবিতাগুলি আবার অন্যজাতের। শর্বরী কবিতাটিতে কবি মানবজীবনের যে অপূর্ব ছবি এঁকেছেন তা অতুলনীয়। আলোবাতাসহীন বদ্ধ পর্বত কন্দরকে কবি বদ্ধ বিষাক্ত আধুনিক সভ্য্যজীবনের প্রতীক রূপে দাঁড় করিয়েছেন। শর্বরী, প্রতিপদ প্রভৃতি কবিতায় তাঁর প্রতীকের সাহায্যে আত্মপ্রকাশ সার্থক হয়েছে। তাঁর মরণতরী কবিতাটি আমার খুব ভালো লেগেছে: এই কবিতাটি পড়্তে পড়্তে বার বার করে ডি, এইচ, লরেন্সের 'দি শিপ্ অফ ডেথ(The (Ship of Death) কবিতাটি মনে পড়্ছিল। এই কবিতাটির ছন্দ-দোলাও বেশ উপভোগ্য। বস্তুত এই কবিতার বইয়ে সুধীন্দ্রনাথকে সর্ব প্রথম মরণ সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন দেখা গেল: মৃত্যুর অসংখ্য প্রতিরূপ তাঁর কবিতাগুলির মধ্যে ইতস্তত ছড়িয়ে আছে।

উত্তর ফাল্গুনী সুধীন্দ্র নাথের কবি-প্রতিভার সার্থক দান। প্রায় প্রত্যেকটি কবিতাই তাঁর বুদ্ধি বিদগ্ধ মনের ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ। কবির স্বভাব-সুলভ সংস্কৃত শব্দ বাহুলতা এবং স্বদেশী ও বিদেশী পৌরাণিক উপমা উৎপ্রেক্ষার পৌনপুনিক উল্লেখের বর্ম ভেদ করে যে কাব্যরসিক অগ্রসর হতে পারবেন, তিনি বঞ্চিত হবেন না বলেই আমার বিশ্বাস। মুদ্রণ-পরিপাট্য এবং অংগ সৌষ্ঠবের দিক থেকেও বইখানি অনিন্দ্যনীয় হয়েছে। কাব্য-রসিক পাঠক সমাজে উত্তর-ফাল্গুনী সমাদৃত হবে বলেই আমার মনে হয়।

গোপাল ভৌমিক

একটি কুসুম—শ্রীমৃগেন্দ্র নাথ খান। রংমশাল প্রেস, মূল্য এক টাকা। পৃঃ ৪৭।

আলোচ্য বইখানি কবিতার বই, কবিতায় একটি প্রেমের কাহিনী লেখাই কবির উদ্দেশ্য। তরুণ কবির ইহাই 'প্রথম পূজোর ফুল'। কবির উপর অনেকের প্রভাব সুস্পষ্ট, কিন্তু তৎসত্বেও তাঁহার একটি স্বাতন্ত্র্য আছে যাহা বইখানির সকল পাঠক পাঠিকাকেই মুগ্ধ করিবে। বর্ত্তমান যুগের অতি আধুনিকতা ও বিশেষ করিয়া গদ্য কবিতার মাঝে 'একটি কুসুমের' সহজ ও অনাড়ম্বর ভাব সত্যই চিত্তাকর্ষক। কবির সহিত বাংলাদেশের প্রকৃত পরিচয় আছে। মনে হয় এই নদী মাতৃক শস্য শ্যামলা বাংলা দেশ কবির সমস্ত অন্তর যেন আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। ঘটনাস্থল আত্রেয়ী নদীর তীরবর্ত্তী একটি গ্রাম। সেখানে গিরিধারী নামক জনৈক ধনীর কন্যা কুসুম পাশের বাড়ীর এক বিধবার একমাত্র পুত্র কানাইয়ের সঙ্গে ছেলেবেলা হইতে খেলাধুলা করিয়া মানুষ হয়। এই খেলাধুলার ভিতর দিয়া দুইটি

শিশু হৃদয় এক বৃন্তে দুইটি ফুলের মত ফুটিয়া উঠে। "এম্‌নি করিয়া কৈশোর গেল -এল মধু যৌবন"। সকলেই জানিত দুইজনের বিবাহ হইবে, কিন্তু ঘটনা চক্রে কুসুমের বিবাহ হইল অন্য এক জনের সঙ্গে, কানাইয়ের সঙ্গে নয়। তাহার পরের ব্যাপারটি খুব সহজ। কানাই দেশত্যাগ করিল এবং কুসুমও ধীরে ধীরে কুসুমের মতই শুকাইয়া আসিল। শেষ কুসুমের মৃত্যু হইল এবং তাহার কিছুদিন পরে কানাইও মারা গেল।

কাহিনীটির মধ্যে নূতনত্ব বিশেষ কিছু নাই সত্য, কিন্তু বলিবার ভঙ্গি ও পারিপার্শ্বিকতার বর্ণনা এই সামান্য কয়েক পৃষ্ঠার বইখানিকে সুখ পাঠ্য করিয়াছে। এ দিক দিয়া কবির মৌলিকতা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কবি যে-ছন্দে লিখিয়াছেন, তাহাও মনোরম হইয়াছে; এরূপ কাহিনী বলিবার পক্ষে ইহাই উপযুক্ত ছন্দ। বইখানিতে একেবারে যে দোষ-ত্রুটি নাই তাহা নয়। কবি এখনও অনভিজ্ঞ, তাই অনভিজ্ঞতাজনিত ত্রুটি বিচ্যুতি মাঝে মাঝে রহিয়া গিয়াছে। তাহারপর কবির উপর রবীন্দ্রনাথের প্রভাব বেশী থাকার ফলে কোন কোন স্থানে তাঁহার লেখা রবীন্দ্রনাথের কবিতার বিশেষ বিশেষ লাইন বা শব্দের কথা মনে করাইয়া দেয়। কিন্তু এ সব দোষ ত্রুটি এমন কিছু নয় এবং বইখানিতে উপভোগ্য জিনিষ এত আছে যে এগুলি অনায়াসে উপেক্ষা করে চলে। বইখানি হইতে কয়েকটি লাইন উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

"জীবনে যাহারা পেয়েছে দুঃখ—লভিয়াছে হাহাকার
মরণে তাদের সুখের স্বপন ভেঙোনা বন্ধু আর!
মন্দাকিনীর স্নেহ-উচ্ছল অসীম করুণা স্রোতে
ভেসে এসেছিল দুটি উৎপল ধরণীর সৈকতে,
পারিজাত সুধা বক্ষে ধরিয়া নামহীন অনামিকা
রচেছিল এই বালুর বেলায় পুলকের দীপ শিখা;
তারপর এক বৈশাখে রাতে মরণের ইঙ্গিতে
ভেসে গেছে সেই আলোর দীপালি আপনারে বলি দিতে
ভরিয়া ধরার বালুর বক্ষ নির্ম্মম বিভাবরী
পাড়ি দিয়ে গেছে অকূল তিমির সহচর-সহচরী!
কুসুম গিয়েছে ঝরিয়া অতীতে দিবসের সমাপনে,
আজিও তাহার স্নিগ্ধ সুরভি ভেসে আসে ক্ষণে-ক্ষণে।"

হারাণ চক্রবর্ত্তী

নদ ও নদী—প্রবোধকুমার সান্যাল। শ্রী পাবলিশিং কোম্পানী ৩৭-৭, বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতার পক্ষ থেকে দিলীপ কুমার বোস কর্ত্তৃক প্রকাশিত। পৃঃ ৩২৪ দাম—আড়াই টাকা।

প্রবোধকুমারের পাঠ্যসংখ্যা নিতান্ত কম নয়। তাঁর এই জনপ্রিয়তার মূলে তাঁর ভ্রমণ কাহিনী বর্তমান। ভ্রমণকাহিনী রচনায় তিনি যতটা পারদর্শিতা দেখাতে পেরেছেন সে পারদর্শিতা তাঁর গল্পে বা উপন্যাসে যে নেই, এমন কথা বলিনে। কেন না, তাঁর লেখা ভ্রমণকাহিনীগুলিও গল্পের ভঙ্গীতে উপন্যাসের জটিলতায় ঠাঁসবুনন। এর থেকেই প্রমাণিত হয়েছে যে প্রবোধকুমার খাঁটি গল্প লেখক, এবং ভ্রমণপ্রিয়।

কিন্তু সে-কথা পুরাতন। তাঁর এই আলোচ্য নূতন উপন্যাসটি যখন স্থানীয় একটি সহযোগিনীতে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হচ্ছিল তখন মাঝে মাঝে টুকরো টাকরা দু'এক ছত্র পড়েছিলাম। তখন সুধু লেখাটাই লক্ষ্য করেছি, গল্পের গতি বা ঘটনার সংঘাতের সঙ্গে পরিচয় ঘটেনি। এখন, সমালোচনার্থে বইটি পেয়ে আগাগোড়া পড়ে দেখা গেলো, প্রবোধকুমারের তেজ এখনো কমে নি। তাঁর কলম এখনো সহজ, তাঁর বক্তব্য এখনো পরিষ্কার।

বইটির সূচনা চিরাচরিত পদ্ধতিতে করা হয়েছে—একটি শিক্ষিত যুবকের সঙ্গে অ—বা অর্দ্ধ-শিক্ষিত মেয়ের বিবাহ নিয়ে গল্পের সূত্রপাত। এই বিবাহ পিতায় পুত্রে সংঘর্ষ বাধালো। এবং নবপরিণীত ও নবপরিণীতায় বিচ্ছেদ ঘটালো। তারপর নায়কের অন্তর্ধান ও নতুন সংঘাতে আত্ম-প্রতিষ্ঠার সুযোগলাভ। এদিকে নায়িকাদের মধ্যে বিরাট পরিবর্তন এসে গেলো। কেউ আঘাত সহ্য করতে করতে নারীর স্বাভাবিক কোমলতা বিসর্জন দিলো, কেউ বা নির্ভীক হয়ে উঠলো। নায়কের জীবনেও পরিবর্তন দেখা যায়: কর্মময় জীবনে সে হয়ে উঠলো রুক্ষ। গল্পের গতি এই পথে প্রবাহিত হয়ে যেখানে এসে থামলো তা এক দিকদিয়ে ভালোই বলতে হবে।

বইটি আগাগোড়া সুখপাঠ্য। কিন্তু মাঝে মাঝে ক্লান্তি এসে যায় সামান্য কথা নিয়ে যখন পাতার পর পাতা অনেক কথা বলা হয়। তা সত্ত্বেও, আশা করা যায়, পাঠক পাঠিকার কাছে এঁর পূর্ব প্রকাশিত অন্যান্য বই-এর মতো এটিরও সমাদর হবে।

বইটির ছাপা বাঁধাই মন্দ নয়। যুদ্ধের দুর্দিনে এতটা মোটা বই-এর তুলনায় দামও সস্তাই বলতে হবে।

সুশীল রায়

চিত্র

রেজ ইন হেভ্‌ন (সামাজিক—প্রেমে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও ঈর্ষ্যা)—মেট্রো গোল্ড উইন মেয়ারের এই বইখানি মে মাসের চতুর্থ সপ্তাহে বোম্বাইতে দেখান হয়েছে, অল্প দিনের মধ্যেই বইখানি ক'লকাতাতে আসবে। বই খানি পরিচালনা করেছেন ডবলিউ. এস্. ভ্যানডাইক্, আর প্রধান চরিত্রগুলিতে নেমেছেন রবার্ট মণ্টগোমারি, মিস্ বার্গম্যান্, জর্জ স্যাণ্ডার্স, লুসিল ওয়াট্‌সন্ এবং আরও অনেকে। বইখানি প্রধানতঃ

রোমাঞ্চকর হত্যারহস্যকে ঘিরে গড়ে উঠলেও এর কাহিনী লিখেছেন জেম্‌স্‌ হিলটন্‌। গুড্‌বাই মিঃ চিপস্‌ এবং লষ্ট্‌ হরাইজন্‌ এঁরই লেখা। কাজেই কাহিনীটি যে ভালই হবে এ আশা করা যেতে পারে। শিক্ষিত এবং বুদ্ধিমান হলেও অতিরিক্ত ভাব প্রবণতায় মানুষ যখন তার মনের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে তখন বিভিন্ন অবস্থায় তার মনে যে ঘাত প্রতিঘাত আসে, মনস্তত্ত্বের এই বিভাগকে ভিত্তি করেই মুখ্যতঃ এই রচনা। সুদর্শন, বুদ্ধিমান যুবক মণ্ট্‌গোমারি মিস্‌ বার্গম্যান্‌কে বিয়ে করার পর ভাবপ্রবণ মনের খেয়ালে যখন হঠাৎ একদিন আবিষ্কার ক'রে বসল যে, স্ত্রী তার অন্তরঙ্গ বন্ধুকেই ভালবাসে, প্রতিদ্বন্দ্বিতা হ'তে মুক্তি লাভের জন্য সে তখন এমন একটা ষড়যন্ত্র করল যাতে হত্যা অপরাধে বন্ধুকেই ফাঁসি কাঠে ঝুলতে হয়। প্রতিদ্বন্দ্বী বন্ধুর চরিত্রে নেমেছেন জর্জ স্যাণ্ডার্স। আশা করা যায় বইখানি দর্শকদের চিত্ত বিনোদন করতে সক্ষম হবে।

কাম্‌ লিভ্‌ উইথ্‌ মি (সামাজিক, বিবাহের পর প্রেম)— এম্‌, জি. এমের এই বইখানা জুনের দ্বিতীয় সপ্তাহে ক'লকাতায় দেখান হয়েছে। অষ্ট্রিয়ার এক কুমারী নিরাশ্রয় হ'য়ে চলে আসে আমেরিকায়। কিন্তু তাকে আমেরিকায় থাকতে হ'লে বিয়ে করতে হবে এক মার্কিন নাগরিককে, না হ'লে ফিরে যেতে হবে স্বদেশে। বাধ্য হ'য়ে সে এক লেখককে বিয়ে করল। বিয়ের ফলে কুমারী বাঁচল নিরাশ্রয় অবস্থায় স্বদেশে ফিরে যাবার হাত হ'তে, আর যতদিন না উপন্যাস বিক্রি ক'রে লাভ করা যায় ততদিন পেটের চিন্তা হ'তে লেখক পেল অব্যাহতি এই ছিল বিবাহের চুক্তি। কিন্তু বিষয়টা ঘোরাল হয়ে উঠল যখন দুজনেই দুজনার প্রেমে পড়ে গেল। কুমারীর ভূমিকায় অভিনয় করেছেন হেদি লামার, আর লেখকের চরিত্রে নেমেছেন জেম্‌স্‌ ষ্টুয়ার্ট। পরিচালনা করেছেন ক্লারেন্স ব্রাউন্‌। বইখানি খুব উচ্চাঙ্গের না হলেও মোটের উপর ভালই বলা চলে। ফটোগ্রাফির জন্য প্রশংসা জর্জ ফোল্‌সের প্রাপ্য।

এ ছাড়া আরও এগারখানা বই এম্‌, জি, এম, ষ্টুডিও-তে তোলা হচ্ছে। ডেভ্‌ মিলার পরিচালিত রঙিন ছবি বিলি দি কিড্‌-এ নেমেছেন রবার্ট টেলর, মেরি হাওয়ার্ড, লন্‌ চেনি (জুনিয়র) হেন্‌রি ওনীল।

আয়ারভিং অ্যাশারের প্রযোজনায় মার্ভিন্‌ লিরয় ব্লসম্‌ ইন্‌ দি ডাষ্ট্‌ বইখানি পরিচালন করছেন। এখানিও রঙিন ছবি। প্রধান ভূমিকায় নেমেছেন গ্রিয়ার গারসন্‌ এবং ওয়াল্টার পিজিয়ন্‌।

ডাঃ জেকিল্‌ এণ্ড মিঃ হাইড্‌ বইখানিতে স্পেন্‌সার ট্রেসির সঙ্গে নেমেছেন ইংগ্রেড্‌ বার্গম্যান্‌ এবং লানা টারনার। পরিচালনা করছেন ভিক্টর ফ্লেমিং, আর ভিক্টর সাভিল হচ্ছেন প্রযোজক।

উইলিয়ম্‌ পাওয়েল আর মার্না লয় নেমেছেন লভ্‌ ক্রেজি ছবিতে। সঙ্গে আছেন গেল্‌ প্যাট্রিক এবং ফ্লোরেন্স বেট্‌স্‌। এর পরিচালক হচ্ছেন প্যাণ্ডো বার্মান্‌।

ক্লারেন্স ব্রাউনের পরিচালনায় দি-ইউনিফর্ম নামে যে ছবিটি তোলা হচ্ছে তাতে আছেন ক্লার্ক গেবল্‌ ও রোসালিণ্ড্‌ রাসেল্‌।

এ ওম্যান্স ফেস্‌ নামে আর একটি বই তোলা হচ্ছে—তুলছেন জর্জ কুকার। জোয়ান্‌ ক্রফোর্ড এবং মেল্‌ভিন্‌ ডগ্‌লাস্‌ এতে অভিনয় করেছেন।